মানুষ অনেক ভাবিয়া, অনেক ভাঙ্গা গড়া করিয়া, অনেক ত্যাগ করিয়া তবে সমাজ সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে। এই সমাজ-সৃজনের মূল কারণ খুঁজিলে বোধ হয় সেখানে রমণীকেই পাওয়া যাইবে। নারী-সমস্যার মীমাংসা করিতে গিয়াই মানবসমাজের সৃষ্টি, কিন্তু অদ্যাপি সেই সমস্যার মীমাংসা হয় নাই। বিংশ শতাব্দীর এতগুলি সভ্যসমাজ এই দুরূহ প্রশ্নের কোনও সদুত্তর ঠিক করিতে পারেন নাই, সেই জন্যই পৃথিবীর সর্ব্বত্র আজ নারীসমাজের সহিত নরসমাজের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে।

নারীজাতির যথার্থ মূল্য বুঝিতে না পারিলে তাহার যথার্থ স্থান নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। আমাদের ভাষায় রমণীকে 'অবলা' বলে, শক্তিহীন, মৃতজাতির ভাষায়ই নারীকে অবলা বলা সাজে। ভাষার ভিতর দিয়া জাতির চরিত্র প্রকাশিত হয়। পাশ্চাত্য সমাজ রমণী জাতিকে fair sex বলিয়া জানে, সেখানে রমণী বিশেষ ভাবে বিলাসের সামগ্রী। তাঁহারা সভ্যতার যতই বড়াই করুন না কেন, স্ত্রীদিগকে যতই স্বাধীনতা দিন না কেন, স্ত্রীশক্তির যথার্থ কেন্দ্রটীর খোঁজ তাঁহারা পান নাই। সে সন্ধান প্রাচীন ভারত পাইয়াছিল বলিয়া মনে হয়, কারণ প্রাচীন ভারতের সাহিত্যে রমণী অবলা নহে, "fair sex" ও নহে, রমণী সেখানে প্রকৃতি হইয়া দেখা দিয়াছিল। রমণীর আখ্যা ছিল জননী, স্ত্রীজাতিকে তাঁহারা জননীর জাতি বলিয়া জানিয়াছিলেন। তাই বিশ্বের আদি কারণকে সেখানে রমণী বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। বিশ্বশক্তিকে রমণী বলিয়া কল্পনা করিয়া প্রত্যেক নারীকে সেই শক্তির বিশিষ্ট প্রকাশ বলিয়া জ্ঞান করাই তাঁহাদের সভ্যতার সাধনা ছিল। ভগবানকে নমস্কার জানাইবার মন্ত্র ছিল "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।" রমণীকে তাঁহারা শক্তির উৎস বলিয়া জানিতেন বলিয়াই তাঁহারা শক্তিশালী জাতি ছিলেন। যে জাতি যে পরিমাণে এই নারীশক্তির ক্ষমতা উপলব্ধি করিয়াছে সেই জাতি সেই পরিমাণে বড় হইয়াছে। আমাদের অপেক্ষা ইউরোপের আধুনিক জাতিগুলি বড়, তাহার কারণ আমাদের অপেক্ষা তাহারা এই স্ত্রীশক্তির অধিক মর্য্যাদা করিতে শিখিয়াছে। জাতির শ্রেষ্ঠতার প্রধান কারণই নারী, কারণ নারীই জাতির জননী। নারী জাতি নেপথ্যে থাকিয়া প্রত্যেক জাতিকে যে জীবন-রসে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতেছেন তাহা কয় জন লোক ভাবিয়া দেখে? ভাবিয়া দেখে না বলিয়াই তাহারা বুঝিতে পারে না, এবং বুঝিতে পারে না বলিয়াই নারীর মর্য্যাদাও করে না। যে জাতি ইহা বুঝিয়াছে তাহারাই এই শক্তিকে সম্মান করিয়া বড় হইয়া গিয়াছে। মানুষ গাছের ফুল দেখিয়াই মুগ্ধ হয়, ফল দেখিয়াই লুব্ধ হয়, কিন্তু কে যে কোথা হইতে এই ফুল

ফুটাইতেছে, ফল ফলাইতেছে তাহা ভাবিয়া দেখে না। কিন্তু যে ব্যক্তি দেখিতে শিখিয়াছে সে জানে যে মাটীর নীচের গুপ্ত শিকড় লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া গাছকে সর্ব্বদা জীবনের রস যোগাইতেছে এবং সেই জীবনই ফলে ফুলে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। প্রত্যেক জাতিও এই গাছের মত, তাহার ফুলের বিকাশ ও ফলের প্রকাশের মূল শিকড় কোন্ নিভৃত প্রদেশে থাকিয়া যে কাজ করিতেছে তাহার খোঁজ সাধারণ মানুষ রাখে না।

মানুষ সে খোঁজ রাখুক আর নাই রাখুক কিন্তু এ কথা সত্য যে নারীই সমাজের প্রাণ। ইউরোপের বিখ্যাত নাট্য শিল্পি ইব্‌সেন্ (Ibsen) বলিয়াছেন "It is you, women, who are the pillars of society." রমণীগণই প্রত্যেক সমাজের ভিত্তি; সে ভিত্তি যদি সুস্থ ও সবল না হয় তাহা হইলে সমাজ টিকিবে কি করিয়া? ইব্‌সেন্ বলেন "The spirits of Truth and of Freedom—these are the Pillars of Society. সুতরাং যে সমাজে সত্য ও স্বাধীনতার মর্য্যাদা নাই সে সমাজকে ভিত্তিহীন বলা যাইতে পারে।

ইব্‌সেন্ সমাজে রমণীগণের যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন ইহাই তাঁহাদের প্রকৃত স্থান, সে স্থান সকলের নীচে হইয়াও সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চে। সমাজকে উন্নত করা, নির্ম্মল করা এবং শক্তিসম্পন্ন করা অন্য কোনও সংস্কারকের কাজ নয়,—বক্তৃতা দিয়া, প্রবন্ধ লিখিয়া সমালোচনা করিয়া সমাজের প্রকৃত উন্নতি হয় না। রমণীই সমাজের প্রকৃত সংস্কারক, রমণীগণের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই সমাজেরও পরিবর্ত্তন ঘটে। পতিত জাতি যদি উঠিতে চায় তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহার কতকগুলি সুমাতার প্রয়োজন। নেপোলিয়ান বলিয়াছেন "The country needs nothing so much to promote its regeneration as good mothers." এ কথা যে কতদূর সত্য স্বয়ং নেপোলিয়ানই তাহার প্রমাণ। শুধু জন্মদান করিলেই নেপোলিয়ানের মত পুত্রের মাতা হওয়া যায় না, পুত্রকে শিক্ষাও দান করিতে হয়। থিয়োডোর পার্কার ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইহার আর দুইটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

সাধারণতঃ লোকের ধারণা যে স্ত্রীলোকগণ পুরুষাপেক্ষা সকল বিষয়েই ছোট। শারীরিক অথবা মানসিক কোনও বিষয়েই তাহারা পুরুষদের সমকক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু এ কথা যে সত্য নয় ইতিহাস হইতে তাহার প্রচুর প্রমাণ সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু আবার একদল লোক আছেন তাঁহাদের মত এই যে রমণীসমাজকে সকল বিষয়ে পুরুষদের সমান অধিকার না দেওয়া নিতান্তই একদেশদর্শিতা ও স্বার্থপরতা। উভয় সমাজের সকল বিষয়ে সমান অধিকার থাকা উচিত। কিন্তু তাঁহাদের এই মত যে ভ্রান্ত তাহা বুঝিতে বিশেষ বেগ পাইতে

হয় না, কাহাকেও ইহা বুঝাইয়া দেওয়া বোধ হয় আবশ্যক হয় না। তাঁহারা নিশ্চয়ই বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখেন নাই নতুবা স্ত্রী পুরুষের এত বড় স্বাভাবিক পার্থক্যটা কি করিয়া তাঁহাদের চক্ষু এড়াইয়া গেল! স্ত্রী-পুরুষে যদি কোন রকম ভেদই না থাকিবে তাহা হইলে ভগবান স্ত্রীকে স্ত্রী এবং পুরুষকে পুরুষ করিয়া গড়িয়াছিলেন্ কেন? আর ইহাও দেখা গিয়াছে যে যাঁহারা স্ত্রী পুরুষের কর্ত্তব্যকে একাকার করিতে চাহিয়াছেন তাঁহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই।

টেনিসন্ ইহার একটা সমন্বয় করিতে চাহিয়াছিলেন—তিনি বলিয়াছেন যে রমণী পুরুষের অসম্পূর্ণ সংস্করণ নহে, কিম্বা রমণী যে চেষ্টা করিলে পরিপূর্ণ পুরুষ হইতে পারেন সে কথাও সত্য নহে। রমণী রমণী, নারীত্বের ভিতরেই তাঁহার পরিপূর্ণ রূপ, রমণী রমণীরূপেই সম্পূর্ণ।

"Woman is not undeveloped man but diverse"

তিনি রমণীর স্থান পুরুষের পার্শ্বে নির্দ্দেশ করিয়াছেন উপরেও নয়, নীচেও নয়। তিনি বলেন যে রমণী ও পুরুষ উভয়ে মিলিয়া সমাজকে সম্পূর্ণতা দান করে এবং সমাজের নিকট উভয়ের মূল্যই সমান,—কেহ কাহারও অপেক্ষা বড় নয়।

"The woman's cause is man's they rise or sink
Together, dwarfed or godlike, bound or free:
If she be small, slight natured, miserable,
How shall men grow?"

নারী যদি অশিক্ষিত, নীচ এবং হীন হয় তবে পুরুষ মহৎ হইবে কি করিয়া? তাহা যে হইতেই পারে না। রমণী তাহার ক্ষুদ্রতা লইয়া পুরুষের উন্নতি-পথের বৃহৎ বাধা হইয়া দাঁড়াইবে। তাই টেনিসন্ বলেন যে পুরুষ পুরুষরূপেই সম্পূর্ণ হইয়া উঠুক এবং নারী নারীরূপেই বিকশিত হইয়া উঠুক, তবেই তাহাদের মিলন সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হইবে। তখন একজন আর একজনের উন্নতি পথের প্রতিবন্ধক স্বরূপ না হইয়া সহায় স্বরূপ হইবে—"Each fulfils defect in each."—ইহা খুব ভাল আপোষের কথা বটে কিন্তু আপোষ হইয়াছে বলিয়াত মনে হয় না। তাহা হইলে কিছুদিন আগে লয়েড্ জর্জ্জের বাড়ীর জানালা গুলির একপ দুরবস্থা হইত না।

মূল কথা হইতেছে এই যে আমরা পুরুষ হইয়া রমণীদের সমস্যা মীমাংসা করিতে পারি না। আমরা তাহাদের যে স্থান নির্দ্দেশ করিব হয়ত তাহা তাহাদের যথার্থ স্থান নয়। হয়ত আমাদের নির্দ্দিষ্ট স্থান তাহাদের মনঃপূত হইবে না,—তাহাকে তাহারা স্বীকার করিতে চাহিবে না। তার পর আমাদের মধ্যেই কেহ তাহাদিগকে ঊর্দ্ধে, অধোতে অথবা পার্শ্বে

স্থাপন করিতেছেন সুতরাং সমাজে তাহাদের যথার্থ স্থান কোথায় সে বিষয় সকলের একমত হওয়া সম্ভবপর নয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে নারী-সমস্যা লইয়া পুরুষদের মাথা ঘামান নিষ্প্রয়োজন। তাহাদিগকে হাত পা বাঁধিয়া রাখিতে হইবে কি মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত ছাড়িয়া দিতে হইবে তাহার বিচার করিবার জন্য আমাদের গম্ভীরভাবে বিচারকের আসনে বসিবার কোনও প্রয়োজন নাই। তাহাদের সমস্যা তাহারাই মীমাংসা করিয়া লইবে। আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া। যে পর্য্যন্ত না আমাদের জনসাধারণ এবং আমাদের দেশের রমণীগণ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবে সে পর্য্যন্ত আমাদের দেশের উন্নতি নাই, জাতির মঙ্গল নাই এবং দেশের কল্যাণ নাই। সমাজে রমণীর স্থান নির্দ্দেশ করিতে না গিয়া তাহাদিগকে শিক্ষাদান করিলে তাহাদের যথার্থ উপকার করা হইবে এবং সমাজে তাহাদের স্থান কোথায় এই প্রশ্নের মীমাংসায় তাহাদিগকে সাহায্য করা হইবে। আমরাও অনেক খানি দুশ্চিন্তার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইব।

কামনা।

১

জগদীশ!
আমারে তোমার বিশ্বে দাও বিলাইয়া
আমি বড় স্বার্থপর
বেঁধে এক ক্ষুদ্র ঘর,
রেখেছি তাহারি মাঝে ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া।
যা কিছু সুন্দর পূর্ণ,
গিরি, নদী, চন্দ্র, সূর্য্য,
যা, সব নয়নে আসে মধুরী মাখিয়া—
যত কিছু স্নেহ-প্রীতি,
আনন্দ, সুখের স্মৃতি,
খ্যাতি, কীর্ত্তি, মনুষ্যত্ব—তৃপ্তি যা' লভিয়া
আমি ভাবি সবি বুঝি আমারি লাগিয়া!

২

আমি কে বুঝিনা নাথ! স্বার্থ কিবা মম,
আমি যে কি অণু কণা,
তাও চির জানিল না,
আমার নিজস্ব কিবা চির প্রিয়তম?
কার তরে আয়োজন,
জীবনের প্রয়োজন,
শুধু খুঁজি—বুঝি না'ক বৃথা পরিশ্রম!
তাই আজি মাগি ভিক্ষা,
তুমি নিজে দেহ শিক্ষা,
করুনার কল্পতরু, গুরু হয়ে মম,
চূর্ণ কর রুদ্ধ জ্ঞান ভস্ম কর ভ্রম।

৩

আমারে দেখাও দেব! উন্মীলি নয়ন,
তোমারি লাগিয়া আসা,
তোমাতে মিশায়ে আশা,
করি তব শুভ ইচ্ছা সাদরে বরণ।

আমার সমগ্র ধরা,
তোমাতে ওউক ভরা,
তোমাতেই দিব আমি সঁপিয়া জীবন
তোমা'র বিশাল ঘরে,
ভুলি গিয়া পরাপরে,
সেবিব যতনে সবে তোমারি কারণ,
তোমারি কল্যাণ ক্ষেম,
অনন্ত অপার প্রেম,
হোক এই দীন প্রাণে রত্ন আভরণ,
পুরাও কামনা, কর সার্থক জীবন।

শ্রীমা—

৺ উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী।

তাঁহার লিখিত ডায়েরী।

১৮৭২। ফাল্গুন, শনিবার।

মুঙ্গের প্রাতঃভ্রমণ--ঈশ্বরের জগতে পর্ব্বত, নদী, বৃক্ষশ্রেণীতে কি সুন্দর ছবি অঙ্কিত। এমন স্থান আছে যেখানে গেলে মন আপনা হইতে ঈশ্বরে ধাবমান হয়। সূর্য্যের কিরণে তাঁর জ্যোতি, সমীরণে তাঁর প্রেমপ্রবাহ, পক্ষীর কূজনে তাঁর মধুরতা অনুভূত হয়—কত সুখ, কত শান্তি। সুখের রাজ্যে বাস করিয়া আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাদিগকে দুঃখী করিয়া রাখি।

নির্জন সাধন মনের অনেক দিনের বাসনা আর পূর্ণ হয় না, কত অবস্থা আসিয়া তাহার প্রতিকূল হয়। সুযোগ পাইলে ভুলিও না। আমরা কেন ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক ঈশ্বরের প্রতীক্ষা করি না। আজ ৫ মিনিট চেষ্টা করিলাম, হইল না, কালি হইল না—এইরূপে বৃথা চেষ্টা হয়। ঈশ্বর বলেন কৈ না হইলে ত আমার সন্তানের চলে, সেও অধিকক্ষণ ধরিয়া চেষ্টা করে না। প্রতীক্ষার মধ্যে ঈশ্বর দর্শনের সঙ্কেত।

১৩ই ফাল্গুন রবিবার।

ভাগলপুর নগরসঙ্কীর্ত্তন Not as to be expected as nothing was prepared. How the wide universe appeared dwelling house, where the sun and sky glorified God and we joined with them. The very thought is sublime.

Sermon যাহা আমার পক্ষে অসম্ভব, ঈশ্বরের পক্ষে সম্ভব, এই দৃঢ় বিশ্বাস চাই।

আলোচনা—বুদ্ধিগত মতকে বিশ্বাসে পরিণত করিতে হইলে সেই মত পরিষ্কাররূপে বুঝা এবং হৃদয়ের ভাব সেইরূপ হইবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা। অকৃতজ্ঞ পুত্র সেই প্রণালীতে কৃতজ্ঞ হয়।

আপনার দিকের সকল বিষয় সম্পূর্ণ থাকিলেও পবিত্র হইতে পারি না—ঈশ্বরের সম্পূর্ণরূপে আপনাকে ছাড়িয়া যত

তাঁহাতে বিশ্বাস হইবে তত উপকার হইবে। তত উপকার পাওয়া যাইবে। Self abnegation লুথারের মত।

রাত্রি—এই সংসার ছাড়া এমন একটী রাজ্য আছে তথায় আধ্যাত্মিক সমুদায় ব্যাপার স্পষ্ট লাভ হয়—যেমন সংসারিক ব্যাপার এখানে। কল্পনার কথা নয়। অনেকে সে রাজ্যে গিয়াছেন, আমরাও সময় সময় গিয়া থাকি। সেই রাজ্যে বাস করিতে না পারিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন নিরর্থক।

১লা মাঘ—১২৮০

ধর্ম্মপরিবার না হইলে চিরকাল আত্মা কোথায় থাকিবে? ঈশ্বরের চরণতলে মস্তক রাখিয়া সকলের সহিত এই পরিবার বন্ধন করিব।

১৬ই চৈত্র ১২৮০

বিভিন্ন ইচ্ছা সকল বিলুপ্ত করিয়া এক ঈশ্বরের ইচ্ছাতে সকলে সংযুক্ত হও, প্রেম পরিবার হইবে।

বিজয় বাবু—ধর্ম্ম প্রচার করা জীবন্ত সর্প লইয়া খেলা করা।

ভূমিতে যত ফোঁটা বৃষ্টির জল পড়ে, তাহা বিফল হয় না, দৃশ্য বা অদৃশ্য ভাবেই হউক, ভূমির উর্ব্বরতার সহায়তা করে।

শূন্য ছোট ও বড় সকলেরই সমান মূল্য।

ইচ্ছা—অর্থ কেবল ইচ্ছা নয়, কিন্তু তজ্জন্য জীবনের ব্যাকুলতা। যদি তাহা না হয় আপনার সাধু ইচ্ছা বলিয়া প্রতারিত হইও না। মনের গতি যদি কুদিকে থাকে, হাজার ভাল ইচ্ছা থাকিলেও আমি পাপে মগ্ন আছি তাহার সন্দেহ নাই।

একটী বিশেষ সঙ্কল্প করিয়া না লাগিলে উদাসীন ভাবে কোন ফল লাভ হয় না।

২৬-৩৮০

(১) অসুরকে সামান্য বলিয়া কিছুমাত্র প্রশ্রয় দিলে ভয়ানক হইয়া প্রাণ বধ করে। ভয়ানক অসুরও উপবাস ও হোম যজ্ঞ দ্বারা নিশ্চয় দমন ও বিনষ্ট হয়। Keep with youlfelf at all time the secret of subduing the monsters. They well know their slaves, never leave them but they fear the God-fearing men.

2 Good resolutions carry out immediately without carring any consequence what ever any obstacle in the way is your veteran enemy, let it be a bad habit.

৩০-১০-৮৫। (পচম্বা)

তুমি প্রাণ জুড়ান ধন, হৃদয় পরশমণি
অমূল্য রতন
প্রাণান্তে তোমায় যেন ভুলিনা কখন।
রাখব তোমায় হৃদয় ঘরে, যতনে আদর
করে,
প্রেম ভক্তি উপহারে করিব পূজন।
তোমা ধনে হয়ে ধনী; (সুখ দুঃখ তুচ্ছ গণি)
আনন্দে দিবা রজনী,
(তব সহবাসি সুখে) করিব যাপন।

পেয়েছি সুধার স্বাদ নামেতে তোমার,
ভুলিতে কি পারি ও নাম, ওকি ভুলিবার।
নাম নয় ভব সুধা, পিতে পিতে বাড়ে ক্ষুধা
ভকত পরাণ সদা নামে মাতোয়ারা,
প্রেম পূর্ণ শান্তি নদী, বহে নামে নিরবধি,
পরশনে মৃত প্রাণে জীবন সঞ্চার।
ঐ নাম সুধা পান করি, মৃত্যুঞ্জয় ত্রিপুরারি,
পার হল ভববারি কত পাপী দুরাচার।
অতি যতনেরই ধন,
প্রাণের প্রাণ তুমি, প্রাণ রমণ।
হৃদয় রতন তুমি পরশ রতন।
সুধাময় করুণা নিধি, আনন্দ প্রেম জলধি,
সর্ব্ব-সন্তাপ-হরণ, সুখ প্রস্রবণ।

৫ই অক্টোবর ১৮-৬—মঙ্গলবার।

পচম্বার আসিবার জন্য যাত্রা করিয়া পথে চুঁচুড়ায় মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করা যায়। তাঁহার দেহে মৃত্যুর ছায়া লক্ষিত হইল, কিন্তু প্রাণ ঈশ্বরে সমর্পিত, পরলোকের সুখাস্বাদন করিতেছে। আহার গিয়াছে, ইন্দ্রিয় সকল বিকল, বিষয়ের সহিত যোগ বিচ্ছিন্ন প্রায়, কিন্তু আশ্চর্য্য তাঁহার স্মরণ শক্তি, আশ্চর্য্য তাঁহার স্নেহ ভালবাসা, সর্ব্বোপরি আশ্চর্য্য তাঁহার ব্রহ্মানুরাগ ও ব্রহ্মানন্দোচ্ছ্বাস। কয়েক দিন পূর্ব্বে তিনি কয়েকটি বন্ধুকে এই শ্লোক দ্বারা তাঁহার জীবনের বর্ত্তমান চিন্তা, ভাব ও কার্য্যের পরিচয় দিয়া ছিলেন :—

অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং
চন্দ্র ইব রাহোর্গ্রাসাৎ প্রমুচ্য
ধূত্বা শরীরং অকৃতঃ কৃতাত্মা,
ব্রহ্মলোকমভি সম্ভবামীত্যভিসম্ভবামীতি।

সংসার বিষয়ের আলাপে তিনি ক্লান্ত নন্ এবং মধ্যে মধ্যে যুবার ন্যায় উৎসাহ প্রকাশ করেন। তিনি তাঁহার জীবনে বিশ্বাস ও ধর্ম্মের জয় কিরূপ হইয়াছে গল্প করিতে বড় আনন্দিত। ব্যাখ্যান এখন তাঁহার নিজের পক্ষে Lesson হইয়াছে বলেন। যখন ব্যাখ্যানের জলন্ত উপদেশ সকল দেন, তখন তাঁহার মুখ হইতে সেগুলি কিরূপে বহির্গত হইত, বুঝিতে পারিতেন না। রবিবার আহারের পর সমাজের বেদীর নীচে বসিয়া ঈশ্বর চিন্তা করিতে করিতে কত কি মনে আসিত। সন্ধ্যার সময় উঠিয়া স্নান করিয়া আসিয়া বেদীতে বসিতেন। যাহা বলিবেন একটু ভাবিয়া লইতেন। পূর্ব্ব সপ্তাহের ব্যাখ্যান পাঠে একটা সূত্র ধরিতে পারিতেন। পরে মুখ হইতে অনর্গল যাহা বলিবার বাহির হইয়া যাইত। এই সময় তাঁহার বৈষয়িক অবস্থা এরূপ যে সমুদায় খোয়াইবার সম্ভাবনা। তিনি সে দিকে অল্প দৃষ্টি করিতেন দিবানিশি ধর্ম্ম বিষয় লইয়া থাকিতেন। ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার কোন বিষয়ে কিছু ক্ষতি হয় নাই।

বিদ্যাৎপুরুষ ঈশ্বর ক্রমে সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশবান হইবেন ব্যাখ্যা করিলেন। ঈশ্বরের অনিমেষ দৃষ্টি অনুভব সাধনের এক উৎকৃষ্ট উপায় বলিলেন Attentive চিত্তের একাগ্রতায় প্রধান সাধন বলিলেন।

অলকা।

গল্প।

১

তখন সবে মাত্র ভোর হইয়াছে—দুই একটি দোয়েল পাখী সঙ্কীর্ণ নদীর পাড়ের বাঁশ গাছের ঝোপের মধ্যে বসিয়া আধ ঘুমঘোরে, আধ অন্ধকারে, আলস্য-বিজড়িত স্বরে, কেবল মাত্র শীস্ দিতে আরম্ভ করিয়াছে—উষার বাতাস সংসার হইতে নিদ্রাদেবীকে সরাইয়া দিবার জন্য কেবল মাত্র মৃদু মৃদু বহিতে আরম্ভ করিয়াছে—এমন সময় বাহিরে দরজায় হঠাৎ যেন কাহার করাঘাতে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিলাম। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। মনে মনে ভাবিলাম—হয়ত ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিয়াছি। মনের মধ্যে কিছুক্ষণ এই কথা তোলাপাড়া করিলাম—কিন্তু কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। অন্যমনস্ক হইয়া বাহিরের ঘরে একটা আরাম-কেদেরায় বসিয়া পড়িলাম। তখন বেশ ফরসা হইয়া গিয়াছে।—ভৃত্য আসিয়া, "চার পেয়ালা" দিয়া ডাকঘরে ডাক আনিতে চলিয়া গেল। আমি বসিয়া বসিয়া সেই কথাই ভাবিতে লাগিলাম। যখন চমক ভাঙ্গিল দেখিলাম আমার কেদারার পাশে একখানি ক্ষুদ্র টেবিলের উপর কয়েক খানি পত্র রহিয়াছে। ভৃত্য কখন ফিরিয়া আসিয়া চিঠি গুলি রাখিয়া গিয়াছে কিছুই জানিতে পারি নাই, আমি সেগুলি লইয়া একখানি একখানি করিয়া সমস্তগুলি পাঠ করিলাম। তাহার মধ্যে একখানি পত্র আমার জনৈক বন্ধু লিখিয়াছিলেন। তিনি পশ্চিমে গভর্ণমেণ্টের কার্য্য করিতেন। পত্রখানিতে লেখা ছিল যে, আমাকে কোনও বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে সেই দিনই তাঁহার কাছে যাইতে হইবে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া, স্নানাহার সমাপন করিয়া আমি বর্দ্ধমান হইতে বেলা দশটার গাড়ীতে রওনা হইলাম। চারি দিকে প্রকৃতির শোভা দেখিতে দেখিতে, কত দেশের পর দেশ, গ্রামের পর গ্রাম পার হইয়া সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরে আমার গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলাম। আমার বন্ধু ষ্টেশনে আমার জন্য অপেক্ষা করিতে ছিলেন, আমি গাড়ী হইতে নামিয়া তাঁহার সহিত গল্প করিতে করিতে তাঁহাদের বাসায় উপস্থিত হইলাম, এবং এ কথা সে কথায় গত রাত্রের কথা একেবারেই ভুলিয়া গেলাম।

আমার বাটী কুসুমপুর। রেল ষ্টেশন হইতে চারি মাইল দূরে অবস্থিত। কুসুমপুর একটি গণ্ডগ্রাম—শুনিতে পাওয়া যায় পূর্ব্বে এখানে অনেক দস্যুর বাসস্থান ছিল। কিন্তু এখন আর সে সমস্ত ভয়

নাই। কালে কালে সকলই অন্তর্হিত হইয়াছে।

আমাদের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নয়। চাকরী বাকরী না করিলেও মোটামুটি এক রকম চ'লিয়া যাইতেছিল। আমি নিজে কিছু কিছু লেখা পড়াও জানিতাম। আমাদের আদি নিবাস বর্দ্ধমানে—সেখানে একটু আধটু বিষয় সম্পত্তিও ছিল। কিন্তু সেখানে আমাদের সরিকানি বিবাদের জন্য বিরক্ত হইয়া আমার পিতা সমস্ত বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া এই কুসুমপুর গ্রামে চলিয়া আসেন। তখন আমি খুব ছেলে মানুষ। আমাদের কুসুমপুরে ২।৩ বৎসর বাসের পর আমার পিতার মৃত্যু হয়। তখন আমার বয়স ৮ বৎসর। সেও আজ প্রায় ১৫।১৬ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। শৈশবে পিতৃহীন হইয়া কিছুদিন পড়া শুনা করিয়া আমি লেখা পড়া ছাড়িয়া দিলাম—সেই অবধি বাটীতেই থাকি। সংসারে কেবল আমি এবং আমার জননী। আমি আজও বিবাহ করি নাই,—মনে সঙ্কল্প আছে, বিবাহ করিবও না।

কুসুমপুরে আমার শয়নকক্ষে একটী আলমারীতে কয়েকখানি পুস্তক ছিল, কখনও তাহা পাঠ করিয়া এবং কখনও দু'একজন প্রতিবেশীর বাটীতে যাইয়া গল্পগুজবে আমার দিনগুলি বেশ কাটিয়া যাইত। কখন কখনও দু'একটী অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে দূর দেশে যাইয়া দু'এক মাস কাল কাটাইয়া আসিতাম।

কুসুমপুরে আমাদের এক ঘর প্রতিবেশী ছিলেন—তাঁহার নাম হরিচরণ মুখোপাধ্যায়। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। আমি অধিকাংশ সময় তাঁহার নিকটে বসিয়া অনেক গল্প শুনিতাম। হরিচরণ বাবু অপুত্রক ছিলেন। সংসারে তাহার স্নেহের বন্ধন এক ভাগিনেয়ী ছিল। তিনি তাহাকে কখনও কাছ ছাড়া করিতেন না। শুনিয়াছি তাঁহার ভগিনীপতি চন্দ্রমাধব চট্টোপাধ্যায় চিরকালই দানে মুক্তহস্ত ছিলেন। ভবিষ্যতের ভাবনা তাঁহার ছিল না বলিলেই হয়। তাঁহার বৃহৎ জমীদারীর কোথায় কি হইতেছে তাহার কোনই তত্ত্বাবধান করিতেন না। কেহ তাঁহাকে সংসারে তাঁহার উক্তবিধ ঔদাসীন্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন "ভগবান্ যাহার অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই হইবে—আমরা অনর্থক পরস্পরে মনোমালিন্য সৃষ্টি করি কেন?" তাঁহার এইরূপ বিষয়কার্য্যে বীতরাগ দেখিয়া কর্ম্মচারিগণ আপনাপন স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত যথেচ্ছরূপ কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল। তাহার শেষ ফল এই হইয়াছিল যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া গেল। হরিচরণ বাবু এই সংবাদ শ্রবণে তাঁহার ভগিনী ও তদীয় কন্যাকে স্বীয় বাটীতে আনয়ন করেন। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই তাঁহার ভগিনীরও কালপ্রাপ্তি হয়। সুতরাং বালিকা শৈশব হইতেই হরিচরণ বাবু ও তদীয় স্ত্রীর আদর ও যত্নে বর্দ্ধিত হইয়া

ছিল। আমি কুসুমপুরে থাকিতে যখনই হরিচরণ বাবুর বাসায় যাইতাম—বালিকা ছুটীয়া বাহিরের ঘরে আসিত। তখন তাহার কোনও সঙ্কোচ বা কোনও সরম বন্ধন ছিল না। হরিচরণ বাবু যখন গল্প করিতেন—বালিকা আমার মুখের দিকে বিলোলনয়নে চাহিয়া দেখিত। তাহার সেই সরল চাহনীতে আমার তখন যেন কেমন লজ্জা বোধ হইত, আমি অন্য দিকে চক্ষু ফিরাইতাম। কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারে আমার নয়নদৃষ্টি পুনরায় সেই সরলতার প্রতিমূর্ত্তি সঙ্কোচহীনা বালিকার প্রতি যে কখন ধীরে ধীরে আসিয়া পতিত হইত, বুঝিতে পারিতাম না। কিন্তু যাক্ সে কথা।

প্রায় এক সপ্তাহ পরে আমার প্রবাসকার্য্য সমাধা করিয়া আমি যখন বাটী আসিয়া পৌঁছিলাম তখন রাত্রি প্রায় ১১টা। পল্লীগ্রামের প্রায় সকলেই তখন শান্তিময়ী নিদ্রার কোলে শায়িত। রজনী জ্যোৎস্নাময়ী। আকাশে দুই একখানি সাদা সাদা মেঘ মাঝে মাঝে ভাসিয়া যাইতেছিল, কোন কোনও বাড়ীর বহিঃপ্রাঙ্গনায় বাঁধা সাদা কাল দুই চারিটী গাভী নিদ্রার ঘোরে রোমন্থন করিতেছিল এবং তাহাদের আশে পাশে দলবদ্ধ মশকের ঐকাতান বাদন রজনীর নিস্তব্ধতার সঙ্গে সঙ্গে বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। আমি বাটী পৌঁছিয়া দুই একবার ডাকাডাকি করিবার পরেই আমার ভৃত্য চক্ষু মুছিতে মুছিতে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া জননীর কক্ষ-দ্বারে আসিয়া তাঁহাকে ডাকিলাম এবং তাঁহার সহিত প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়া শয়ন করিতে গেলাম। জননী খাবার কথা জিজ্ঞাসা করায় বলিলাম আমি খাইয়া আসিয়াছি এবং আমার শয়ন কক্ষের দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িলাম। পথশ্রান্তিতে বিশেষ ক্লান্তি বোধ হওয়াতে অল্পক্ষণের মধ্যেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

যখন ঘুম ভাঙ্গিল, দেখিলাম তখন একটু বেলা হইয়াছে—চারিদিকে রৌদ্রের কিরণ পড়িয়া আমার কক্ষটী বেশ আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে। আমি বাহিরে যাইলাম এবং প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া খবরের কাগজপাঠে মনঃসংযোগ করিলাম। কিন্তু কেন জানি না মন যেন কেমন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। আমি পাঠ বন্ধ করিয়া হরিচরণ বাবুর বাটীর উদ্দেশে বহির্গত হইলাম। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখি, তাঁহার সদর দরজায় তালা বন্ধ। আমার আপনা আপনিই একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস বাহির হইল—যেন কিরূপ এক শূন্যতা অনুভব করিতে লাগিলাম—যেন কিসের অভাব বোধ হইতে লাগিল—যেন কি ছিল—এখন নাই! যেন কি আশা করিয়াছিলাম—তাহা মিটাইতে পারিলাম না।

বাড়ী আসিয়া জননীর মুখে শুনিলাম, আমি যে দিন পশ্চিমে যাই, সেই দিন

রাত্রিতে হরিচরণ বাবু সপরিবারে তীর্থ ভ্রমণে চলিয়া গিয়াছেন।

এইরূপ ভাবে কিছুদিন গেল। আমি পরিবর্ত্তনশীল কালের সঙ্গে সঙ্গে নবীনত্বে পা চালিয়া দিয়া সমস্ত পুরাতন স্মৃতি ও অতীত ঘটনা একে একে বিস্মৃত হইলাম। হঠাৎ এক দিন আমার মনে হইল আবার যেন কে আমার দুয়ারে আসিয়া আঘাত করিল। তখন ঠিক মধ্য রাত্রি। আমি কেবলমাত্র বাতি নিবাইয়া শুইয়া পড়িয়াছি। তখনও ঘুমাই নাই। আস্তে আস্তে চোরের ন্যায় উঠিয়া খুব আস্তে আস্তে দরজার নিকটে যাইলাম। মনে হইল যেন কে বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমি খিল খুলিয়া ফেলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখি কে একটী অবগুণ্ঠনবতী রমণী আমার ঘরের পাশে দাঁড়াইয়া আছে। আমি কম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম "কে ?" কিন্তু কোনও উত্তর পাইলাম না। আমার কথা যে তাহার কাণে পৌঁছিয়াছে এমনও বোধ হইল না। আমি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কে"? অবগুণ্ঠনবতী হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া অবগুণ্ঠন আরও একটু টানিয়া দিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেলেন। আমি অনেকক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। কি যে ভাবিয়াছিলাম তাহা ঠিক স্মরণ নাই—কেবল এইমাত্র মনে আছে যে, একটি অবগুণ্ঠিতা রমণী লজ্জায় জড়সড় হইয়া নিস্তব্ধতার কোলে যেন কোথায় মিশাইয়া গেল। এই ঘটনার পর কতদিন চলিয়া গিয়াছে। প্রত্যহই সন্ধ্যা হইলে আমার প্রাণের মাঝে কেমন যেন একটা আকুলি বিকুলি করিয়া উঠে—কেমন যেন একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস আপনা আপনিই বাহির হইয়া পড়ে—কেমন যেন সন্ধ্যার উদার বাতাসের সহিত একটা অনন্ত ভাবনা আপনি আপনিই আসিয়া পড়ে কিছুই বুঝিতে পারি না। যেন কি একটা অব্যক্ত কৌতূহলে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ি।

এইরূপে আরও কিছুদিন গেল। আমি কাহাকেও কিছু বলিলাম না।—কিন্তু অনেকেই আমার এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং দুই একজন আমাকে প্রশ্নও করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি সে প্রশ্ন হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম।

ছেলেবেলা হইতেই বিদেশ ভ্রমণের প্রলোভনটা আমার পক্ষে অপরিহার্য্য ছিল। কিন্তু সকল সময় সুযোগ হইয়া উঠিত না কারণ, জননী গৃহে একা থাকিতে পারিতেন না। আমার বোধ হয় জননীর আপত্তি করিবার আরও বিশেষ একটু কারণ ছিল—সে কারণ তিনি মুখে কিছু না বলিলেও আমি বুঝিতে পারিতাম—সেটী আমার কৌমার্য্য। পাছে, আমি সন্ন্যাসী হইয়া যাই, পাছে দেশ-পর্য্যটনের ছুতা করিয়া আর গৃহে ফিরিয়া না আসি, এই ভয়ে বিদেশে যাইতে চাহিলেই তাঁহার স্নেহবিগলিত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস অশ্রুকণাতে

পরিণত হইয়া কঠিন শৃঙ্খলের ন্যায় আমাকে বেষ্টন করিয়া ধরিত—আমার আর যাওয়া হইত না। কিন্তু মনটা বিশেষ খারাপ হওয়াতে আমি অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া এবার তাঁহার অনুমতি আদায় করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। আমি আমার গন্তব্য স্থান হরিদ্বার ঠিক করিয়া পরদিন পাঞ্জাব মেলে রওনা হইলাম। একাকী যাইব মনস্থ করিয়াছিলাম কিন্তু জননীর একান্ত ইচ্ছায় পুনরায় ভৃত্য নীলমণিকে সঙ্গে লইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। হরিদ্বারে একটী বাঙ্‌লো গোছের ছোট বাসা ভাড়া লইয়া কয়েক দিন সেখানে নিভৃত জীবন অতিবাহিত করিলাম। তখন শরতের প্রারম্ভ। প্রাবৃটের বর্ষণশীল জলধারা নাই বলিলেই হয়। আমি প্রাতে উঠিয়া বাঙ্গালোর বারাণ্ডায় একখানি আরাম-কেদারায় বসিয়া বসিয়া দেখিতাম দূরে পর্ব্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে কেমন মেঘগুলি সাজিয়া থাকিত! দূরে দূরে কেমন তাহারা ভাসিয়া যাইত! পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ দিয়া রজতসূত্রের ন্যায় ক্ষীণকায়া নির্ঝরিণী রৌদ্রের আলোয় কেমন চিক্‌চিক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিত! নীলাকাশের নীচে পাখীরা কলরব করিতে করিতে কোন্ সুদূরে উড়িয়া যাইত, দূরে জাহ্নবীর তীরে বেদ পাঠ করিতে করিতে কত সন্ন্যাসী প্রোজ্জ্বল সূর্য্যকে কতবার নমস্কার করিত—তাহাদের সুমধুর কণ্ঠ-নিঃসৃত বেদগান ক্ষীণতর হইতে ক্ষীণতম হইয়া কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া প্রাণের মধ্যে কি এক আবেশ জাগাইয়া দিত। মনে হইত সেই সুদূর অতীতের আর্য্য ঋষিদের কথা, মনে করিয়া কতবার ভক্তিপ্রণত-চিত্তে উদ্দেশে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতাম। অপরাহ্ণে প্রায়ই গঙ্গার ধারে পর্ব্বতের উপরে, অনেক দূর অবধি বেড়াইয়া আসিতাম।

সেদিন শুক্লপক্ষের সপ্তমী। আমি দৈনন্দিন্ অভ্যাসানুযায়ী বেড়াইতে বেড়াইতে অনেক দূরে গিয়া পড়িয়াছিলাম। যখন ফিরিয়া আসি তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। পশ্চিমাকাশে ভাঙ্গা চাঁদখানি পাহাড়ের উপর হাসিতেছিল—দূরে সান্ধ্য বাতাস পাগলের মত এ পাহাড় হইতে ও পাহাড়ে যেন কাহাকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিল। বনের ভিতর হইতে কত রকম ফুলের গন্ধ মাঝে মাঝে ভাসিয়া উঠিতেছিল। মাথার উপর কত নিশাচর পাখী কত রকম ডাক্ ডাকিয়া উড়িয়া যাইতেছিল। আমি অনেক দূর তখন চলিয়া আসিয়াছি—একটা পাহাড়ের উপর হইতে নামিয়া আসিয়া যেমন সমতল ভূমিতে পদার্পণ করিব—এমন সময় সম্মুখে যেন কোনও মনুষ্যের মূর্ত্তি দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম—পরক্ষণেই চক্ষু মেলিয়া আর কিছু দেখিতে পাইলাম না। ও কিছু নয়—ভাবিয়া দুই এক পদ অগ্রসর হইতে না হইতেই আবার পূর্ব্ববৎ বোধ হইল! তখন পাশে যেখানে পর্ব্বত হইতে ঝরণা বাহির হইয়া খানিকটা সমতল ভূমিতে হঠাৎ হ্রদের মত স্থির হইয়া

আছে সেই দিকে ভাল করিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম—অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে যেন মনে হইল তাহারই তীরে কে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে। আমি সেই দিকে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গেলাম। গিয়া দেখিলাম একটী রমণী—যুবতী নীরব নিশ্চল ভাবে দণ্ডায়মান। আমি অনেকক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়াইয়া রহিলাম। যেন বোধ হইতে লাগিল রমণীর তীক্ষ্ণদৃষ্টি আমার মুখের প্রতি স্থাপিত—সে দৃষ্টি ব্যাকুলতাময়—যেন কি চায় স্থির করিতে পারিলাম না। উভয়েই অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। তখন ক্ষীণ চন্দ্র পর্ব্বতের পার্শ্বে ঢলিয়া পড়িয়াছে। বাতাস গুলি ছুটীয়া আসিয়া ক্ষুদ্র হ্রদের ঢেউগুলিকে সপ্রেম আলিঙ্গনে জড়াইয়া ধরিয়া পায়ের বালুকার উপর কেমন ধীরে ধীরে শায়িত করিতেছিল—জলের মধ্যে পাথরগুলি এক একবার মাথা তুলিয়া তাহাদের খেলা দেখিয়া পুনরায় ঢেউগুলির মধ্যে কোথায় ডুবিয়া যাইতেছিল—পর্ব্বতের শৃঙ্গ শৃঙ্গে চাঁদের আলোয় গাছের পাতাগুলি কেমন চক্‌মক্‌ করিতে ছিল—পর্ব্বতের নীচের অন্ধকার ক্রমশ ঘনীভূত হইয়া সমস্ত প্রকৃতিকে যেন স্তব্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। আমি আর একবার রমণীর মুখের প্রতি চাহিলাম—মরি মরি—এত সৌন্দর্য্য বুঝি আর কখনও দেখি নাই। সে কি দেখিলাম কেমন করিয়া বুঝাইব। সেই করুণ দৃষ্টিতে যে কি কারুণ্য মাখান ছিল কেমন করিয়া বুঝাইব—সেই কালো কালো তারাবিশিষ্ট চক্ষু, সেই কুঞ্চিত অলকদাম—সেই যুগ্ম ভ্রূযুগল—সেই কারুণ্যমাখা মুখখানি—সেই নির্জ্জন বনমধ্যে যে কি সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাই বা কেমন করিয়া বুঝাইব? আমি কি এক প্রকার মোহাভিভূত হইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম। ধীরে ধীরে যেন কি মনে পড়িতে লাগিল—যেন কি এক অতীত স্মৃতি হৃদয়ে আসিয়া আঘাত করিতে লাগিল। আমার ক্ষীণকণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল—"অলি"—রমণী হাসিলেন। সে কি হাসি? ফুল ঝরিয়া যাইবার আগে যে হাসি হাসে, প্রদীপ নিভিবার আগে যেমন হাসে—চাঁদ ডুবিবার সময় যেমন হাসে এও বুঝি সেই হাসি। পৃথিবীতে সব ভুলিব সে হাসি কখন ভুলিব না—সেই মুহূর্ত্তে যদি মরিতাম—সেই মুহূর্ত্তে যদি বাতুলতা প্রাপ্ত হইতাম তাহা হইলে হয়ত ভুলিতে পারিতাম।

আমার সব মনে পড়িয়া গেল। সহস্র অতীত স্মৃতি একসঙ্গে হৃদয়ে সমুপস্থিত হইয়া আমাকে একেবারে অভিভূত করিয়া তুলিল। আমি কেমন এক ব্যাকুল প্রাণে রমণীর দিকে অগ্রসর হইলাম—সে মূর্ত্তি সরিয়া গেল—আমি যন্ত্রণা পীড়িত হৃদয়ে ডাকিলাম—"অলকা!" কোনও উত্তর পাইলাম না। রমণী পুনরায় হাসিলেন সেই ক্ষীণ হাসি!—আমি আরও অগ্রসর হইলাম—সে মূর্ত্তি যেন

চকিতের মধ্যে বনমাঝে কোথায় মিলাইয়া গেল। তখন চাঁদ ডুবিয়া গিয়াছে—অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে—উন্মাদ পবন হু হু করিয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম—আর কিছু দেখিতে পাইলাম না। আকুলকণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিলাম "অলি! —অলকা!"

সেই নিস্তব্ধ নিশীথে পাহাড়ের কন্দরে কন্দরে কেবল প্রতিধ্বনি উত্তর করিল—"অলি!—অলকা!" আর কিছু শুনিতে পাইলাম না। আমি সেইদিন বাসায় ফিরিয়া অলকার অনুসন্ধান করিয়াছিলাম—শুনিলাম কিছুদিন পূর্ব্বে হঠাৎ বিষম জ্বরে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। অলকা হরিচরণ বাবুর ভাগিনেয়ী।

শ্রীক্ষীরোদগোপাল রায়।

রহস্য।

সংসার যখন তা'রে কোলাহল মাঝে
আকুল আহ্বানে ডেকে—আপনার কাজে
রাখে তারে ভুলাইয়া, স্নেহ-আবরণে
লুকাইয়া রাখে আহা! হৃদয়ে—গোপনে,—
তুমি তারে ডেকে লও ইঙ্গিতে তোমার
রাতুল চরণ-প্রান্তে;—শুধু এ'সংসার—
জেগে রয় বুকে লয়ে পবিত্র নির্ম্মল
মুক্ত-প্রাণ হাসি তা'র—আর অশ্রু জল!
তারপর—তারপর অতি ধীরে ধীরে
সংসার ঢালিয়া দেয় অনন্ত সাগরে
প্রাণের সকল ভার,—মিশে যায় সব!
আবার সেথায় উঠে নব কলরব!
এমনি মায়ার খেলা! তবু এ'সংসার—
বোঝেনা—যে যায়—সেত ফিরে নাক আর!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

বারাণসী তত্ত্ব।

প্রথম অধ্যায়।

হিন্দুদিগের সপ্ততীর্থ-মধ্যে কাশীই প্রধান। যথা:—

কাশী কাঞ্চী চ মায়াখ্যা ত্বযোধ্যা দ্বারবতাপি।
মথুরাবন্তিকা চৈতাঃ সপ্ত পুর্য্যোঽত্র মোক্ষদাঃ

কাশী, কাঞ্চী (কাঞ্চী), মায়া, অযোধ্যা, দ্বারাবতী, মথুরা, অবন্তিকা—এই সাত তীর্থ মোক্ষদা বলিয়া খ্যাত।

মায়া এখন হরিদ্বারকে বলে। উক্ত সপ্ত তীর্থের মধ্যে কাশীর নামই সর্ব্ব প্রথমে রক্ষিত হইয়াছে কারণ কাশীই সকলের প্রধান বলিয়া গণ্য। কাশী

অতি পুরাতন নগর, মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বে কাশীর নাম উল্লেখ আছে যথাঃ—

ত্রিদিবং গ গতো রাজা যযাতির্নহুষাত্মজঃ॥
পুরুশ্চকার তদ্রাজ্যং ধর্ম্মেণ মহতাবৃতঃ।
প্রতিষ্ঠানে পুরবরে কাশিরাজো মহাযশাঃ॥

পৃথিবীতে যে সকল পুরাতন নগরের কথা আমরা অদ্যাবধি শুনিয়াছি তন্মধ্যে কাশীই যে সকলের অপেক্ষা পুরাতন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ব্যাবিলন যখন নিনেভার সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত, টাইরি যখন স্বীয় উপনিবেশের রাস্তা প্রশস্ততর করিতেছিল, এথেন্সের যখন অভ্যুদয়ের প্রারম্ভ, রোমের বাহুবল যখন পৃথ্বীতলে প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছিল তাহার বহু পূর্ব্বেই ভারতবর্ষে কাশী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। সলোমনের নাম যখন দিগন্তবিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তখন তাঁহার রাজধানী সুশোভিত করিবার জন্য কাশী হইতে হাতির দাঁতের জিনিষ সকল রপ্তানি হইত। কাশী বহুকাল হইতেই পূজিত হইয়া অদ্যপিও সঞ্জীবিত আছে। পৃথিবীতে কত কত রাজ্য, কত কত অভ্যুত্থান ও পতন হইয়া গিয়াছে, কাশী কিন্তু ভারতবর্ষে সমানভাবে পূজিত হইয়া আসিতেছে। প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র যাত্রী কাশীতে আগমন করে। কাশীর নাম হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পার্য্যন্ত প্রসিদ্ধ। ভারতের সকল স্থান হইতেই বৃদ্ধগণ কাশীতে মরণ লালসায় আগমণ করে। কাশীর সত্র নিচয় বিত্তা-র্থীর জন্য প্রতিষ্ঠিত। বিধবাগণ মন্দিরে টাকা জমা দিয়া সারাজীবন আপনাদিগের আহারের বন্দোবস্ত করিতে পারে। এই সকল কারণের জন্য দূর দেশ হইতে লোকে কাশীতে আগমন করে। কাশী হিন্দু ধর্ম্মের মহীয়সী শক্তির জাজ্বল্যমান প্রমাণ, বৌদ্ধ ধর্ম্মের মহা-শ্মশান এবং ষড় দর্শনের লীলা ক্ষেত্র। এইখানেই মহারাজ হরি-শ্চন্দ্র ধর্ম্মার্থে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া হীন-বৃত্ত চণ্ডালের চাকরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই খানেই ভগবান শঙ্করাচার্য্য স্বীয় অদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। এই খানেই শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ শাস্ত্রীয় তর্কে পরাজিত হন। কালের কঠোর আঘাতে হিন্দুদিগের সবই গিয়াছে, বাকী আছে কেবল মাত্র ধর্ম্ম, তাহাও কিন্তু এখন ঘোর তমসা-চ্ছন্ন।

কাশীর সেবা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। প্রবাদ আছে :—

রাঁড়, ষাঁড়, সিঁড়ি, সন্ন্যাসী।
ইনসে বাঁচে সেবে কাশী।

অর্থাৎ বিধবা, ষাঁড়, সিঁড়ি এবং সন্ন্যাসী হইতে যাঁহারা বাঁচেন তাঁহারাই কাশীর সেবা করিতে পারেন নতুবা নহে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ষাঁড় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—দেখিলেই ভয়ের উদ্রেক হয়। তখন লোকে ভাবে আর কাশী সেবার আব-শ্যকতা নাই, প্রাণ বাঁচিলে অনেক ধর্ম্ম হইবে। পকবিম্বাধরা বিধবাগণের সংখ্যা কম নহে সুতরাং রসিক চূড়ামণিদিগের অভাব নাই। সিঁড়ি চড়িতে চড়িতে

লোকে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহাও দেবদর্শনের একটি বাধক। সন্ন্যাসীদিগের জন্য লোককে জ্বালাতন হইতে হয়। এ সকল বাধা সত্বেও তীর্থস্থান মাত্রই পুণ্যজনক বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কাশীখণ্ডে লেখা আছে :—

প্রভাবাদদ্ভুতাদ্ ভূমেঃ সলিলস্য চতেজসা।
পরিগ্রহান্মুনীনাঞ্চ তীর্থানাং পুণ্যতাস্মৃতা॥

ভূমির অদ্ভুত প্রভাবহেতু, সলিলের তেজ-জন্য এবং মুনিগণের পরিগ্রহ-হেতু, তীর্থসমূহ পুণ্যজনক বলিয়া গণ্য।

এই জন্যই তীর্থে পাপিগণের সমাগম অধিক হয়। তাহাদিগের ধারণা যে, তীর্থগমনে সর্ব্বপাপের নাশ হইয়া থাকে। সুতরাং এমন সুযোগ তাহারা ছাড়িবে কেন? তাহারা জানে না যে শাস্ত্রের আদেশ অন্যরূপ; যথা :—

যো লুব্ধঃ পিশুনঃ ক্রূরো দাম্ভিকো বিষয়াত্মকঃ।
সর্ব্বতীর্থেষ্বপি স্নাতঃ পাপমলিন এব সঃ॥
অশ্রদ্দধানঃ পাপাত্মা নাস্তিকোঽচ্ছিন্নসংশয়ঃ।
হেতুনিষ্ঠশ্চ পঞ্চৈতে ন তীর্থফলভাগিনঃ॥
(কাশীখণ্ড)

অর্থাৎ যে লোভী, নিন্দক, ক্রূর, দাম্ভিক, বিষয়াসক্ত, সে যদি সর্ব্বতীর্থে স্নান করে তাহা হইলেও সে পাপ মলিন থাকিবে।

শ্রদ্ধাহীন, পাপাত্মা, নাস্তিক, সন্দিগ্ধ, ও হেতুনিষ্ঠ এই পাঁচ শ্রেণীর ব্যক্তি তীর্থফলভোগী হয় না।

মহানির্ব্বাণতন্ত্র আরও বলেন :—

ত্যক্ত্বা স্বাধ্যয়নং পিত্রোঃ শুশ্রূষাং দাররক্ষণম্।
নরকায় ভবেত্তীর্থং তীর্থায় ব্রজতাং নৃণাম্॥

অর্থাৎ অধ্যয়ন, পিতামাতার শুশ্রূষা এবং দাররক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া তীর্থে গমন করিলে তীর্থ নরকের হেতু হইয়া থাকে।

সমস্ত সহরটা বেনারস বা কাশী নামে খ্যাত। কিন্তু কেহ কেহ সহরটীকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন। যথা, বেনারস, কাশী এবং কেদার। বর্ত্তমান সহরের উত্তরাংশের নাম বেনারস, দক্ষিণাংশের নাম কাশী এবং কাশীর দক্ষিণ কেদার নামে খ্যাত। শেষোক্তটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

পুলিস এবং মিউনিসিপাল কার্য্যের জন্য বেনারস সাত ভাগে বিভক্ত, যথা ভেলুপুরা, দশাশ্বমেধ, চৌক, চেতগঞ্জ, কোতয়ালী, জাইতপুরা এবং আদমপুরা। ইহাতে সিকরোল এবং ক্যান্টনমেণ্ট যোগ করিলে, একুনে নয়টী বিভাগ হয়। এক একটীর বৃত্তান্ত আমরা পৃথক পৃথক বলিব। পরন্ত বর্ণনাসৌকর্য্যার্থে নদীসম্মুখস্থ স্থানগুলি হইতে আরম্ভ করিতে বাধ্য হইলাম।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নদীসম্মুখস্থ ভেলুপুরা।

সহরের দক্ষিণপ্রান্তে অসিনালা অবস্থিত। যে স্থানে গঙ্গা আসিয়া মিলিত হইয়াছেন সেই স্থান হইতে ঘাট ও মন্দিররাজির প্রারম্ভ বলিতে হইবে।

ঘাটে শত শত নরনারী স্নান করিতেছে। নিরীহ ব্রাহ্মণগণ স্নানান্তে ঘাটে উপবেশন করিয়া পূজায় তৎপর রহিয়াছেন। মহিলাগণ জলে অবগাহন করিয়া স্বীয় স্বীয় ইষ্টদেবতার স্মরণ করিতেছেন আর রমণী লাবণ্য দর্শন-লোলুপ ব্যক্তিগণ অনিমেষ নয়নে যুবতীদিগের প্রতি চাহিয়া আছেন। টিকটিকি যেমন মক্ষিকা-প্রয়াসে বসিয়া থাকে পাণ্ডাগণও স্নাতক দিগের জন্ম অনুরূপ প্রতীক্ষা করিতেছে। ঘাটে যাইবামাত্রই ঘাটমাহাত্ম্য শুনিতে পাওয়া যায়। স্নাতকগণও সেই ধ্বনি শুনিয়া স্বীয় গন্তব্য ঘাটে যাইয়া স্নান করিয়া থাকে। ইহাতে পাণ্ডাগণেরও কথঞ্চিত ধনাগম হয়। স্নানের জন্ম প্রসিদ্ধ ঘাটপঞ্চকের মধ্যে অসিঘাট একটি। প্রবাদ এইরূপ যে, দুর্গাদেবী শুম্ভ নিশুম্ভ অসুরদ্বয়কে পরাভূত করিয়া দুর্গাকুণ্ডে আগমন করতঃ বিশ্রাম করিয়াছিলেন। এই সময়ে আপনার অসি ফেলিয়া দিলে তথায় এক নালা প্রস্তত হইয়া যায়; তাহাই এখন অসিনালা নামে খ্যাত। যাহারা এই নালাটি পার হইয়া কাশীতে গমন করে, দেবীর কৃপায় তাহারা বিগত-কল্মষ হয়। নিকটেই জগন্নাথ দেবের মন্দির। এখানে তিনটী মূর্ত্তি বিরাজমান—দক্ষিণে জগন্নাথ, বামে বলদেব এবং মধ্যে সুভদ্রা। প্রথম মূর্ত্তিটীর হাতের উপরার্দ্ধ আছে নিম্নার্দ্ধ নাই। ইঁহার পদদ্বয়ের অস্তিত্ব আমরা দেখিতে পাইলাম না। শেষোক্ত মূর্ত্তিটী হস্তপদ বিহীন। মূর্ত্তির একটা পারিপাট্য হওয়া আবশ্যক, কিন্তু আমরা তাহা কিছু দেখিলাম না। সুতরাং ইহা হিন্দুশিল্প কিনা তাহাতে আমাদিগের সন্দেহ রহিল। যে হিন্দুজাতির সভ্যতা বহু পুরাতন, যাহাদিগের শিল্প আজিও পাশ্চাত্য জগতের অনুসন্ধানের বিষয় তাহারা যে এবম্ভূত কদর্য্য শিল্প রাখিবে ইহা আমার কল্পনায়ও আইসে না। সত্য বটে হিন্দুর ধর্ম্মজীবনে বাহ্যিক পারিপাট্য লক্ষ্যের বিষয় নহে—আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যই তাহার মুখ্য লক্ষ্য, তথাপি যখন মূর্ত্তিই রাখিতে হইয়াছে তখন একটা ভাল মূর্ত্তিই রাখা উচিত ছিল। জগন্নাথদেব হিন্দুর নমস্য। সুতরাং আমরাও ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করিলাম। আষাঢ় মাসে রথযাত্রার সময় যখন জগন্নাথদেব রথারূঢ় হন তখন একটা বড় মেলা হইয়া থাকে। স্নানযাত্রার দিন জগন্নাথদেবকে স্নান করাইয়া সন্ধ্যাকালে ভক্তদিগকে দেখান হয়। এই সময়ে অসিঘাট হইতে জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি লইয়া আসিয়া রথে রাখা হয়। উড়িষ্যাতে জগন্নাথদেবের যেরূপ মেলা হয় তাহার অনুকরণেই এই মেলা হইয়া থাকে। মেলাটি তিন দিন থাকে। তৃতীয় দিনের মেলায় প্রায় ৫০ হাজার লোকের সমাগম হইয়া থাকে। ভাদ্রমাসেও এই স্থানটিতে আর একটী মেলা হয়, পরন্তু তাহা তত বড় নহে। এই মেলাটি অসি-সঙ্গম অথবা লোহারিকুণ্ডের সান্নিধ্যে হইয়া থাকে। কুণ্ডটীতে দুইটী কূপ

আছে। ইন্দোরের সুপ্রসিদ্ধা রাণী অহল্যা বাই, বিহারের রাজা এবং অমৃত রাও এই কূপের খননকর্ত্তা। মেলার দিন হিন্দুগণ সূর্য্যপূজার জন্য এই কুণ্ডে স্নান করেন। কূপের তিন দিকে সিঁড়ি আছে। নিম্নে অবতরণ করিতে হইলে উক্ত সিঁড়ির আশ্রয় লইতে হয়। সিঁড়ির উপর সূর্য্যদেবের মূর্ত্তিস্বরূপ একটী চক্র আছে। রবিবারে লোকে ইহার পূজা করিয়া থাকে। জগন্নাথদেবের নিকট কতকগুলি আখাড়া আছে, যাহার মধ্যে বড়া গুদড়জীর আখাড়াটীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। আখাড়াটী প্রায় সার্দ্ধ তিন শত বৎসর ব্যাপিয়া স্বীয় অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে। ইহাতে প্রায় ত্রিশ জন বৈষ্ণব বৈরাগী বাস করেন। আখাড়ার প্রতিষ্ঠাতার নাম গুদড়জী। বলা বাহুল্য, ইনিও একজন বৈষ্ণব ছিলেন। ছোটা গুদড়জীও বৈষ্ণব বৈরাগীদিগের সম্পত্তি পরন্তু ইহা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে ইহার অস্তিত্ব চলিয়া আসিতেছে এবং লোকের অনুকম্পায় আখড়াটীর সরবরাহ চলিতে থাকে। দিগম্বরী আখড়াটিতে দশ বৈরাগী ব্যক্তির বাস। ইহারা ভিক্ষোপজীবী। নগ্ন হইয়া থাকে বলিয়া ইহারা দিগম্বরী নামে খ্যাত। আখড়াটিও আধুনিক। বৈদ্য-আখড়ার প্রতিষ্ঠাতার নাম স্বামী রামদাসজী নন্দ। ইনিও বৈষ্ণব ছিলেন। প্রায় ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে এই আখড়াটি তৈয়ার হয়। চুনারের সন্নিকটস্থ খজুরীপুর নামক স্থানে এই আখাড়াটীর কিছু সম্পত্তি আছে। অসি সঙ্গমের নিকট ব্রাহ্মণদিগের "পণ্ডিতজী" আখাড়া অবস্থিত। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে টীকাদাস নামক জনৈক ব্যক্তি এই আখাড়াটী নির্ম্মাণ করেন। এই স্থানের শিষ্যগণকে ঐহিক এবং পারত্রিক সম্বন্ধীয় শিক্ষা দেওয়া হয়। বিহারান্তর্গত আরা এবং দ্বারভাঙ্গা নামক স্থানের জমিদারী হইতে এই আখাড়াটির সরবরাহ চলিয়া থাকে। অ সনহল্লার কৃষ্ণ আচারী নামক এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ দ্বারা কৃষ্ণ আচারী আখাড়া প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনি ১৮৬৫ খৃঃ কাশীধামে আগমন করিয়া ব্রাহ্মণদিগের জন্য একটী বিদ্যালয় এবং মন্দির স্থাপন করেন। আখাড়াটীতে শিষ্যসংখ্যা প্রায় ২০ জন। আখাড়াটীর সরবরাহের জন্য ইংরাজ-সরকারের নিকট প্রায় আট হাজার টাকা গচ্ছিত রাখা হইয়াছে। তাহার সুদ হইতে এবং বেতিয়ার রাজার মাসিক ৫০ টাকা চাঁদা হইতে আখাড়াটীর সকল খরচ চলিয়া থাকে। কাশীতে বিষ্ণুপন্থি আখড়াটিই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রসিদ্ধ সংস্কারক রামানুজ ইহার প্রতিষ্ঠাতা। এই স্থানের শিষ্যগণ সকলেই ভিক্ষোপজীবী। দাদুপন্থি আখাড়া বুকন নামক জনৈক ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। ইনি অপুত্রক ছিলেন। এক দিন নদী-সৈকতে একটী শিশুকে অসহায় অবস্থায় পতিত দেখিয়া তাহাকে বাটী লইয়া আসিয়া তাহাকে পালন করেন। এই শিশুর নাম দাদু। সাড়ে তিন শত বৎসর

পূর্ব্বে দাদু সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া দাদু পন্থী নামক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন অসিঘাটের নীচেই তুলসী ঘাট। মহাত্মা তুলসীদাস বারানসীক্ষেত্রে বহুকাল নিবাস করিয়া ১৬২৩ খৃঃ দেহত্যাগ করেন। বঙ্গদেশের জয়দেব যেমন কৃষ্ণ-ভক্ত ছিলেন, মহাত্মা তুলসীদাসও তেমন রামভক্ত ছিলেন। ইহাঁর মনোমুগ্ধকারী সরল কবিতা যিনি একবার পড়িয়াছেন, তিনি জীবনে ইহার নাম কখনও বিস্মৃত হইবেন না। হিন্দি ভাষা যতদিন সঞ্জীবিত থাকিবে ততদিন তুলসী দাসের নাম লুপ্ত হইবে না। মহাত্মা তুলসী দাসের অনেকগুলি স্মৃতিচিহ্ন মন্দিরে রক্ষিত রহিয়াছে। তিনি যে হনুমান মূর্ত্তির পূজা করিতেন এবং যে তরণী করিয়া নদীর পরপারে যাইতেন তাহার কিয়দংশ এখনও আমাদিগের নয়ন পথের পথিক হয়। হনুমান ঘাটে নাগাদিগের "জুনি" আখাড়া আছে। এলাহাবাদ, হরিদ্বার উজ্জয়িনী এবং গোদাবরীতে উক্ত আখাড়াটীর শাখা দৃষ্ট হইয়া থাকে। নাগাগণ ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানেই পরিভ্রমণ করে। রাজপুতানার রাজগণ এবং ভারতের অন্যান্য রাজন্যবর্গ ইহাদিগের পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং তাহারা অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ। হনুমান ঘাটে প্রবাদ আছে যে রামদাস নামক জনৈক দ্যূত-ক্রীড়কের এক রাত্রির জুয়ার টাকা দ্বারা ঘাটটি নির্ম্মিত হইয়াছে। ঘাটের উপরিস্থিত একটী প্রকোষ্ঠে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গুরু বল্লভাচার্য্য বাস করিতেন। ১৬২০ খৃঃ শাস্ত্র ব্যাখ্যা কালে ইনি পদস্খলিত হইয়া নদীতে পড়িয়া যান ও তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। হনুমান ঘাটের পরেই রায় বলদেব সাহা এবং বাচ্ছ রাজ ঘাট। এই ঘাটের বড় বিশেষ প্রসিদ্ধি নাই। অতঃপর একটী প্রসিদ্ধ শিবালয় আছে। পূজার জন্য বহু লোক এখানে আসিয়া থাকে। এখানে যে একটী দুর্গ দেখা যায়, তাহার নির্ম্মাতার নাম বৈজনাথ মিশ্র। এই খানেই রাজা চেত সিংহ বাস করিতেন। ১৭৮১ খৃঃ বিদ্রোহী হওয়ার অপরাধের জন্য তাঁহার বসত বাটীটি বেদখল করিয়া দিল্লীর সম্রাটগণের বংশধরগণকে দেওয়া হয়। কিছু দূরেই শিবালয় ঘাট। এখানে দুইটি আখাড়া আছে;—একটীর নাম নির্ব্বাণী এবং অপরটির নাম নিরঞ্জনী প্রথমটী ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে নগ্ন নাগাগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, যাহাদিগের একটী শাখা এলাহাবাদে দৃষ্ট হইয়া থাকে। দ্বিতীয়টিও নাগাদিগের সম্পত্তি, পরন্তু ইহাদিগের প্রধান আড্ডা বরোদায়। ইহারা নিরংকার অর্থাৎ অমূর্ত্ত দেবতার উপাসক। শিবালয় ঘাটের পরই লীলা ঘাট আর কেদার ঘাট। বাঙ্গালীদিগের কেদারেশ্বরের মন্দির হইতে এই ঘাট ক্রমশঃ নিম্নে চলিয়া গিয়াছে। বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনের মধ্যে কেদারেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। ইহার চারি কোণে আরও চারিটী মন্দির আছে। মধ্যে বারাণ্ডার ভিতর অনেক দেবতারই মূর্ত্তি দেখা যায়।

বাঙ্গালীগণ কেদারেশ্বরের বিশেষ ভক্ত সুতরাং মন্দিরে ভীড় লাগিয়াই থাকে। পূর্ব্বদিকের দরজা দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। এখান হইতে একটি প্রশস্ত রাস্তা নদী পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। দরজার দুই পার্শ্বে কৃষ্ণ-প্রস্তর-নির্ম্মিত দুইটী মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিদ্বয় দেখিতে অতীব সুন্দর। ইহাদিগের প্রত্যেকটার চারি হস্ত। এক হস্তে ত্রিশূল, দ্বিতীয়টীতে গদা, তৃতীয়টিতে পুষ্প এবং চতুর্থট খালি। এই খালি হাতটি আঙ্গুল নির্দ্দেশ করিয়া যেন আগন্তুকগণকে কহিতেছেন "তোমরা এইখানে অবস্থান কর, দেবাদেশ প্রাপ্ত হইলে ভিতরে যাইও"। যখন কতকগুলি ব্যক্তি মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করে তখন দরজা বন্ধ হইয়া যায়। তাহাদিগের পূজা সাঙ্গ হইলে দ্বার পুনরায় উদ্ঘাটিত হয় এবং তখনই বহিঃস্থিত ব্যক্তিগণ ভিতরে প্রবেশ করিতে পান।

উক্ত মূর্ত্তির মধ্যস্থিত স্থান দিয়া মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিতে হয়। দ্বারদেশে সপ্তবর্ত্তী দীপ দিবার বন্দোবস্ত আছে। সায়ংকাল সমাগত হইলে এই সকল দীপরাজি প্রজ্বলিত করা হয়। মন্দিরের ভিতর কেদারেশ্বরের বিগ্রহ বিরাজিত। কেদারেশ্বর মহাদেবের নামান্তর মাত্র। কেদার কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে। হিমালয়ে কেদার নামে একটী স্থান আছে। মহাদেব সেইখানে বাস করেন। এতদ্ধেতু তিনি কেদার নামে খ্যাত। কিন্তু বেনারসে প্রবাদ এই যে, কেদার নামে এক ভক্ত ব্রাহ্মণ ছিল। বশিষ্ঠ ঋষির সহিত তিনি হিমালয়ে যান এবং তথায় তিনি এই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন। মরিবার সময় মহাদেব তাঁহাকে দেবত্ব অর্পণ করেন। তদবধি তিনি মহাদেবের সহিত পূজা পাইয়া আসিতেছেন। মহাদেব বশিষ্ঠ ঋষির উপাসনায় প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলেন, "তুমি বর প্রার্থনা কর, আমি তোমার উপাসনায় সন্তুষ্ট হইয়াছি।" তখন বশিষ্ঠ মুনি এই প্রার্থনা করেন যে, আপনি বারাণসী ধামে আগমন করিয়া বাস করুন। মহাদেব তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিত হন। তদবধি তিনি বেনারসে আসিয়া বাস করিতেছেন। এই বৃত্তান্তটি কাশীখণ্ডে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনন্ত তুষার মণ্ডিত হিমালয়ে হরিনাথ নামে এক বিখ্যাত মন্দির আছে তাহার সন্নিকটে কেদারেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। এখানেও অনেক তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়।

কেদারেশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দেবমূর্ত্তিও আছে, যথা—লক্ষ্মীনারায়ণ, ভৈরবনাথ, গণেশ এবং অন্নপূর্ণা। যে দ্বার দিয়া ঘাটে যাওয়া যায় তাহার উপর বাঙ্গালা এবং হিন্দি ভাষায় কেদারেশ্বরের মহিমা লেখা আছে। মন্দিরের বহির্ভাগে ভিখারীগণ বসিয়া থাকে। লোক দেখিবামাত্র তাহারা ভিক্ষার জন্য কেহ বা হস্ত প্রসারণ করিয়া দিতেছে এবং কেহ বা শত ছিন্ন বসন পাতিয়া দিতেছে। তাহাদিগকে দেখিলেই পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হয়।

কেদারেশ্বরের ঘাটের নীচেই গৌরী-কুণ্ড নামে একটি কূপ আছে। প্রবাদ এইরূপ যে, সেই কূপোদকে জর আরোগ্য হয়। কেদারেশ্বরের নীচে চৌকী ঘাট। এখানে একটী অশ্বথ বৃক্ষ পথিকগণকে প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ডতাপ হইতে রক্ষা করিতেছে। ১৫ই আষাঢ় এখানে "বাতাস পরীক্ষা" নামে একটি মেলা হয়। এইদিনে হিন্দু-গণ স্বীয় স্বীয় গুরুর পূজা করিয়া থাকেন। এতদ্ধেতু ইহা গুরু-পূর্ণিমা নামে খ্যাত। পুরাকালে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ সায়ংকালে এই স্থানে সমাগত হইয়া বায়ুপ্রবাহ নির্ণয় করতঃ জলদাগম ও শস্য সম্বন্ধে ভবিষ্য-দ্বাণী বলিতেন। চৌকা ঘাটে বিজয়া দশমীর দিন রামলীলার মেলা হইয়া থাকে। এই দিনে লঙ্কেশ্বর রাবণ, রাম-চন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। সেই অতীত কাহিনীর স্মৃতি সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য হিন্দুগণ রামলীলা করিয়া থাকেন। এই মেলায় অনূ্ন ত্রিশ সহস্র লোকের সমাগম হইয়া থাকে। এই দিনে শমী বৃক্ষের পূজা হইয়া থাকে। যদি এই সময়ে নীলকণ্ঠ পক্ষীর দর্শন পাওয়া যায় তবে হিন্দুগণ শুভ লক্ষণ বলিয়া মানিয়া থাকেন।

অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম মঙ্গল অথবা শনিবারে চৌকা ঘাটে বরুণা শিয়াল মেলা হইয়া থাকে। নীচ জাতীয় ব্যক্তি-গণ এই মেলাতে মদ্য, মাংস এবং সরবত দ্বারা কালকা এবং সাহজীর পূজা করিয়া থাকে। কালকা ব্রাহ্মণী এবং সাহজী চর্ম্মকার রমণী ছিল। পূজা সমাধা হইলে ব্যক্তিগণ শিবপুরে যাইয়া অতিশয় মদ্য পান করে এবং পরদিনে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগত হয়।

১৫ই অগ্রহায়ণ চৌক ঘাটে নগর প্রদ-ক্ষিণের মেলা হইয়া থাকে। দুই দিনে সমগ্র নগরটা প্রদক্ষিণ করিতে হয়। প্রথম দিনের প্রদক্ষিণকার্য্য চৌকা ঘাট হইতেই আরম্ভ হইয়া থাকে।

চৌকা ঘাট হইতে কিছু অগ্রসর হই-য়াই রুক্মেশ্বর দেবের মন্দির বিরাজমান। ইহার নিকট অন্যান্য মন্দিরও আছে। অতঃপর নারদ ঘাট। দেবর্ষি নারদের নামে এই ঘাটটীর নামকরণ হইয়াছে। ইহার পরেই ভেলুপুরার উত্তর সীমা।

শ্রীমতী হেমন্ত কুমারী দেবী।

শিখগ্রন্থ—সুখমণি সাহিব।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

বিরথী শাকত কি আরজা।
সাচ বিনা কহ হোবত সুচা।

বিরথা নাম বিনা তন অন্ধ।
মুখ আবত তাকৈ দুর্গন্ধ।

বিন সিমরণ দিন রৈন বৃথা বিহায়।
মেঘ বিনা যিউ খেতী যায়।
গোবিন্দ ভজন বিন বৃথে সভ কাম।
যিউ কিরপন কে নিরয়াথ দাম।
ধংন ধংন তে জন যিহ ঘট বসিও হরি নাউ।
নানক তাকৈ বলি বলি যাউ ॥৬
শাক্তদিগের জীবন বৃথা।
সত্য বিনা কেমন করিয়া পবিত্র হইবে?
নাম বিনা তনু বৃথা এবং অন্ধ;—
এমন ব্যক্তির মুখ হইতে দুর্গন্ধ আসে।
হরিস্মরণ বিনা রাত্রি এবং দিন বৃথা কাটায়;—
যেমন জল বিনা খেত নষ্ট হয়।
গোবিন্দ ভজন বিনা সকল কার্য্যই বৃথা;—
যেমন কৃপণের ধন বৃথা পড়িয়া থাকে।
সেই ব্যক্তিই ধন্য ধন্য যাহার হৃদয়ে হরিনাম বাস করে।
নানক এমন ব্যক্তিকে বলিহারি যান ॥৬
রহত অবর কিছু অবর কমাবত।
মন নহী প্রীত মুখহু গংড লাবত।
জানন হার প্রভু পর বীন।
বাহর ভেখন কাহু ভীন।
অবর উপদেশৈ আপ ন করৈ।
আবত যাবত জনমৈ মরৈ।
জিসকৈ অন্তর বসৈ নিরঙ্কারা।
তিসকী সীখ তরৈ সংসারা।
যো তুম ভানে তিনে প্রভ জাতা।
নানক উন জন চরন পরাতা ॥৭
কত রয়েছে তবুও মনে আরও বাসনা।
মুখে ভগবত প্রীতি দেখায় কিন্তু মনে নাই।
কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ প্রভু সকল জানেন।
বাহিরে ভালবাসার ভান কিন্তু ভিতরে ভিন্ন।
অপরকে উপদেশ দেয় কিন্তু আপনি তাহা করে না।
সে কেবল আসে ও যায়, জন্মে ও মরে।
কিন্তু যার অন্তঃকরণে নিরঙ্কার বাস করেন;
তার শিক্ষাতে সংসার তরে যায়।
যাহাদিগকে প্রভু তুমি ভাল বাস, তাহারাই প্রভুকে জানে;
নানক এমন ভক্তের চরণে পতিত হন্ ॥৭
করউ বেনতী পারব্রহ্ম সভ জানৈ।
অপনা কীয়া আপহি মানৈ।
আপহি আপ করত নিবেরা।
কিসৈ দুর জনারত কিসৈ বুঝারত নেরা।
উপাব সিয়াপন সগল তে রহত।
সভ কছু জানৈ আতম কী রহত।
জিস ভাবৈ তিস লয়ে লড় লায়।
থান থনন্তর রহিয়া সমায়।
সো সেবক জিস কিরপা করী।
নিমখ নিমখ জপ নানক হরি ॥৮
ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর, তিনি সব জানেন।
তিনি আপনার কার্য্য আপনি করিতেছেন।
তিনি আপনিই সকল ব্যবস্থা করিতেছেন।
কাহাকেও তিনি বুঝান যে তিনি দূরে আছেন, কাহাকেও জানান নিকটে আছেন।

তিনি সকল প্রকার ধূর্ত্ততা ও ফিকিরে রহিত।

তিনি আত্মার গতি সব জানেন।

যাহাকে তিনি কৃপা করেন তাহাকে নিজের অঞ্চলে টানিয়া লন।

সকল স্থানে তিনি ব্যাপ্ত রহিয়াছেন।

যাহাকে তিনি কৃপা করেন সেই তাঁহার সেবক হইতে পারে।

নানক বলিতেছেন, সেই ব্যক্তি প্রতি নিমেষে হরি নাম জপ করে।

শ্লোক ৮।

কাম ক্রোধ অরু লোভ মোহ বিনশ যায় অহমেব।

নানক প্রভ শরণাগতী কর প্রসাদ গুরুদেব॥

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এবং অহঙ্কার নষ্ট হইয়া যায়।

নানক বলিতেছেন যে প্রভুর শরণ লইয়াছে, গুরুদেব তাহাকে দয়া করেন॥

অষ্টপদী।

যিহ প্রসাদ ছতিহ অংমৃত খাহি।

তিস ঠাকুর কউ রখ মন মাহি।

যিহ প্রসাদ সুগংধর তন লাবহি।

তিস্কউ সিমরত পরম গতি পাবহি।

যিহ প্রসাদ বসহি সুখ মন্দর।

তিসহি ধিয়ায় সদা মন অন্দর।

যিহ প্রসাদ গৃহ সংগ সুখ বসনা।

আট প্রহর সিমরহু তিস রসনা।

যিহ প্রসাদ রংগ রস ভোগ।

নানক সদা ধ্যাই ঐ ধ্যাবন যোগ॥১

যাঁহার প্রসাদে ছত্রিশ প্রকার অন্ন খাইতেছ,

সেই ঠাকুরকে মনোমধ্যে রাখ।

যাঁহার প্রসাদে সুগন্ধি বস্ত ভোগ করিতেছ,

তাঁহাকে স্মরণ করিলে পরম গতি প্রাপ্ত হইবে।

যাঁহার প্রসাদে সুখের ভবনে বাস করিতেছ,

তাঁহাকে সর্ব্বদা মনোমধ্যে ধ্যান কর।

যাঁহার প্রসাদে সকলের সঙ্গে সুখে গৃহে বাস করিতেছ,

তাঁহাকে অষ্ট প্রহর রসনায় স্মরণ কর।

যাঁহার প্রসাদে রঙ্গ রস ভোগ করিতেছ,

নানক বলিতেছেন, তাঁহাকে সর্ব্বদা ধ্যান কর, তিনি ধ্যানের যোগ্য॥১

যিহ প্রসাদে পাট পটংবর হঢাবহি।

তিসহি ত্যাগি কত অবর লুভাবহি।

যিহ প্রসাদে সুখ শেজ সোইজৈ।

মন আট প্রহর তাকা যশ গাবিজৈ।

যিহ প্রসাদ তুঝ সভ কোউ মানৈ।

মুখ তাকো যশ রসন বখানৈ।

যিহ প্রসাদি তেরো রহতা দর্ম্ম।

মন সদা ধ্যায় কেবল পার ব্রহ্ম।

প্রভজী জপত দরগহ মান পাবহি।

নানক পতি সেতী ঘর যাবহি॥২

যাঁহার প্রসাদে রেশমের বস্ত্র পরিধান করিতেছ।

তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য কত বিষয়ে তুমি লোভ করিবে?

যাঁহার প্রসাদে সুখ শয্যায় শয়ন কর,

হে মন অষ্টপ্রহর তাঁহারই যশ গাও।

যাঁহার প্রসাদে তোমাকে সকলে সম্মান করিতেছে,

তোমার মুখ যেন সর্ব্বদা তাঁহারই যশো-
গান করে ।

যাঁহার প্রসাদে তুমি ধর্ম্মপথে আছ,
হে মন সর্ব্বদা সেই পরব্রহ্মেরই ধ্যান কর।
প্রভুর নাম জপ করিয়া তুমি তাঁহার দ্বারে
সম্মান পাইবে,
নানক বলিতেছেন, সম্মানের সহিত তুমি
তাঁহার ঘরে যাইবে ॥২

যিহ প্রসাদ অরোগ কংচন দেহী ।
লিব লাবহু তিস রাম সনেহী ।
যিহ প্রসাদ তেরা ওলা রহত ।
মনু সুখ পাবহি হরি হরি যশ কহত ।
যিহ প্রসাদ তেরে সগল ছিদ্র ঢাকে ।
মন সরনী পর ঠাকুর প্রভ তাকৈ ।
যিস প্রসাদ তুঝ কো ন পহুচে ।
মন শাসি শাসি সিমরহু প্রভ উচে ।
যিহ প্রসাদ পাই দুর্ল্লভ দেহ ।
নানক তাকী ভগতি করেহ ॥৩

যাঁহার প্রসাদে অরোগী এবং কাঞ্চনবর্ণ
দেহ পাইয়াছ,
হে বন্ধু, সেই রামের প্রতি অন্তঃকরণকে
সম্পূর্ণরূপে লাগাও ।
যাঁহার প্রসাদে তোমার উপর সর্ব্বদা
আবরণ রহিয়াছে,
হে মন, সেই হরির যশ গান কর, সুখ
পাইবে ।
যাঁহার প্রসাদে তোমার সকল দোষ
ঢাকিয়া যায়,
হে মন, সেই ঠাকুর সেই প্রভুকে স্মরণ কর।
যাঁহার প্রসাদে তোমার তুল্য কেহ হইতে
পারে না,
হে মন সেই উচ্চ প্রভুকে প্রতিশ্বাসে স্মরণ
কর ।
যাঁহার প্রসাদে দুর্ল্লভ দেহ পাইয়াছ,
নানক বলিতেছেন, তাঁহাকে ভক্তি কর ॥৩

যিহ প্রসাদ আভূখণ পহিরিজৈ ।
মন তিস সিমরত কিউ আলস কিজৈ ।
যিহ প্রসাদ অশ্ব হস্ত অসবারী ।
মন তিস প্রভ কউ কবহু ন বিসারী ।
যিহ প্রসাদ বাগ মিলখ ধনা ।
রাখ পরোয় প্রভু অপনে মনা।
যিন তেরী মন বনত বনাই ।
উঠত বৈঠত সদ তিসহি ধিয়াই ।
তিসহি ধিয়ায় যো এক অলখৈ ।
ইহা উহা নানক তেরী রখৈ ॥৪

যাঁহার প্রসাদে তুমি ভূষণ পরিধান কর,
হে মন, তাঁহাকে স্মরণ করিতে আলস্য
কেন ?
যাঁহার প্রসাদে তুমি অশ্ব হস্তী যান অর্থাৎ
সওয়ারিরূপে পাইয়াছ
হে মন, সেই প্রভুকে কখনও ভুলিও না ।
যাঁহার প্রসাদে তুমি উদ্যান, বিষয় এবং
ধন পাইয়াছ,
সেই প্রভুকে তুমি তোমার অন্তঃকরণে
গাঁথিয়া রাখ ।
হে মন, যিনি তোমাকে সাজাইতেছেন,
তুমি উঠিতে বসিতে সর্ব্বদা তাঁহাকেই
স্মরণ করিবে ।
তাঁহাকেই ধ্যান কর, যিনি এক এবং
অলক্ষ্য ।
নানক বলিতেছেন, তিনি ইহলোকে এবং
পরলোকে রক্ষা করেন ।৪

যিহ প্রসাদি করহি পুংন বহু দান।
মান আট প্রহর করি তিস্‌কা ধ্যান।
যিহ প্রসাদ তুঁ আচার বেওহারী।
তিস প্রভকউ শ্বাসি শ্বাসি চিতারী।
যিহ প্রসাদি তেরা সুন্দর রূপ।
সো প্রভু সিমরহু সদা অনূপ।
যিহ প্রসাদি তেরি নিকি জাতি।
সো প্রভু সিমরহু সদা দিন রাতি।
যিহ প্রসাদ তেরী পতি রহৈ।
গুরু প্রসাদি নানক যশ কহৈ ॥৫

যাঁহার প্রসাদে তুমি অনেক পুণ্য দান করিতেছ,
হে মন, অষ্ট প্রহর তাঁহারই ধ্যান কর।
যাঁহার প্রসাদে তুমি আচারী ও ব্যবহারী,
সেই প্রভুকে তুমি প্রতি শ্বাসে স্মরণ রাখিও।
যাঁহার প্রসাদে তুমি সুন্দর রূপ পাইয়াছ,
সেই অনুপম প্রভুকে সর্ব্বদা স্মরণ করিও।
যাঁহার প্রসাদে তুমি উত্তম জাতিতে জন্মিয়াছ,
সেই প্রভুকে রাত্রি দিন স্মরণ কর।
যাঁহার প্রসাদে তুমি সম্মানিত হও,
নানক বলিতেছেন, গুরুপ্রসাদে তাঁহার যশ কীর্ত্তন কর ॥৫

যিহ প্রসাদি শুনহি কর্ণ নাদ।
যিহ প্রসাদি পেখহি বিসমাদ।
যিহ প্রসাদি বোলহি অংমৃত রসনা।
যিহ প্রসাদি সুখ সহজে বসনা।
যিহ প্রসাদি হসত কর চলহি।
যিহ প্রসাদি সংপূরণ ফলহি।
যিহ প্রসাদি পরম গতি পাবহি।
যিহ প্রসাদ সুখ সহজ সমাবহি।
ঐসা প্রভু তিয়াগ অবর কত লাগহু।
গুরু প্রসাদি নানক মন জাগহু ॥৬

যাঁহার প্রসাদে কর্ণ শুনিতে পায়,
যাঁহার প্রসাদে চক্ষু নানা বস্তু দেখে,
যাঁহার প্রসাদে রসনা মিষ্ট বাক্য বলে,
যাঁহার প্রসাদে তুমি সুখে ও শান্তিতে বাস কর,
যাঁহার প্রসাদে হস্ত কার্য্য করে,
যাঁহার প্রসাদে তুমি সম্পূর্ণ ফল লাভ কর,
যাঁহার প্রসাদে তুমি পরম গতি প্রাপ্ত হও,
যাঁহার প্রসাদে সুখে ও সহজে মন মগ্ন হয়,
এমন প্রভুকে ছাড়িয়া অপর কিসে আকৃষ্ট হইবে?
নানক বলিতেছেন, গুরু প্রসাদে জাগরিত হও ॥৬

যিস প্রসাদি তুঁ প্রগট সংসার।
তিস প্রভকউ মূল ন মনহু বিসার।
যিহ প্রসাদি তেরা পরতাপ।
রে মন মূঢ় তু তাকউ জাপ।
যিহ প্রসাদি তেরে কারয পূরে।
তিসহি জান মন সদা হজুরে।
যিহ প্রসাদি তুঁ পাবহি সাচ।
রে মন মেরে তু তাসিউ রাচ।
যিহ প্রসাদি সভকী গতি হোয়।
নানক জাপ জপৈ জপি সোয় ॥৭

যাঁহার প্রসাদে তুমি সংসারে সম্মানিত,
সেই প্রভুকে কখনও মন হইতে ভুলিও না।

যাঁহার প্রসাদে তুমি প্রতাপবান্,
হে মূঢ় মন, তুমি তাঁহাকে জপ কর।
যাঁহার প্রসাদে তোমার কার্য্য পূর্ণ হয়,
হে মন, তাঁহাকে সর্ব্বদা সম্মুখে জানিও।
যাঁহার প্রসাদে তুমি সত্যকে লাভ কর,
হে আমার মন, তুমি তাঁহারই সঙ্গে প্রেম কর।

যাঁহার প্রসাদে সকলের গতি হয়,
নানক বলিতেছেন, যদি জপ কর ত তাঁহারই জপ কর॥৭

আপি জাপয়ে জপৈ সো নাউ।
আপি গাবায়ে সু হরিগুণ গাউ।
প্রভ কিরপা তে হোয় প্রগাস।
প্রভু দয়াতে কমল বিগাস।
প্রভু সুপ্রসংন বসৈ মন সোয়।
প্রভু দয়াতে মতি উত্তম হোয়।
সরব নিধান প্রভ তেরীময়া।
আপহু কছু ন কিনহু লয়া।
জিত জিত লাবহু তিত তিত লগহি হরি নাথ।
নানক ইনকৈ কছু ন হাথ॥৮

তিনি যাহাকে জপান সেই নাম জপ করিতে পারে।
তিনি যাহাকে গাওয়ান, সেই হরিগুণ গান করিতে পারে।
প্রভুর কৃপাতে হৃদয়ে জ্ঞানালোক প্রকাশ হয়।
প্রভুর কৃপাতে হৃদয়-কমল প্রস্ফুটিত হয়।
প্রভু সুপ্রসন্ন হইয়া যাহার হৃদয়ে বাস করেন,
প্রভুর কৃপাতে তাহার সুমতি হয়।
হে প্রভু, সকল সম্পদ তোমারই মায়া,
কাহারও কিছু আপনার নাই।
হে হরি, হে নাথ, যাহাতে তুমি লাগাও তাহাতেই যেন মানুষ থাকে।
নানক বলিতেছেন, মানুষের কিছু হাত নাই॥৮

ভুট্টা*।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ভুট্টার ফুল monoecious, যেহেতু ইহার পুং-অংশ (tassel) ও স্ত্রী-অংশ (ear) একই গাছে থাকে। এইরূপ আপনার আপনার মধ্যে রক্তের সম্বন্ধ লইয়া যে গর্ভ হয়, তাহাকে in-breeding বলে। আবার পুং-অংশের পুষ্পরেণু অন্য বা দূরবর্ত্তী গাছের স্ত্রী-অংশের সহিত মিলিত হইয়া যে গর্ভের সৃষ্টি হয়, তাহাকে cross-breeding বলা হয়। পাঠক পাঠিকা! এক্ষণে বোধ করি in-breeding ও cross-breeding-এর কি প্রভেদ তাহা বুঝিলেন।

* এ সম্বন্ধে আরও কিছু জানিবার ইচ্ছা থাকিলে ১৯১৪ ফেব্রুয়ারি মাসের মডার্ণ রিভিউতে "Hybridization Methods in Maize" নামে লেখকের প্রবন্ধ দেখুন।

ভালরূপ ভুট্টার ফসল পাইতে হইলে in-breeding বা cross-breeding এর আবশ্যক, তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাক। কোন কোন ফসলের, যেমন তামাকু গাছের, উন্নতি করিতে হইলে, in-breeding এর আবশ্যক, কিন্তু ভুট্টার পক্ষে ইহা অনিষ্টকর। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, in-breeding বশতঃ (১) ভুট্টা গাছ হইতে কম ফসল পাওয়া যায়, (২) ভুট্টার এক একটি বিচির অঙ্কুরোদ্গম-শক্তি নিস্তেজ হয়, বীর্য্যের সে রকম তেজ থাকে না। (৩) বিচগুলি দেরীতে পক্ক হয়; (৪) ভুট্টার আকারও ছোট হয় ও ওজনে ভারী হয় না। আমরা আমাদের দেশের ভুট্টাকে cross-breeding এর দ্বারা কিরূপে আরও ভাল করিতে পারি তাহা এইবার বলিব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ভুট্টা অনেক জাতীয় আছে। মনে করা হউক যেন আমরা আমাদের বাগানে একজাতীয় ভুট্টার বিচি বপন করিব। cross-breeding করিতে হইলে লাইন করিয়া সারি সারি ভুট্টার বিচি লাগাইতে হইবে। শ্রেণীগুলির মধ্যে কিছু ব্যবধান থাকা চাই—যেমন নিম্নে দেখান হইয়াছে:—

D
১নং শ্রেণী ....
T
২নং " ______________________
D
৩নং " ....
T
৪নং " ______________________

"D" চিহ্নিত শ্রেণীর গাছগুলি বড় হইলে, তাহাদের পুং-অংশ (অর্থাৎ tassel) বাহির হইলে (পুষ্পরেণু পড়িবার পূর্ব্বেই) ঐ পুং-অংশ সমুদায় টানিয়া ভাঙ্গিতে হইবে, কিন্তু গাছের যেন কোন অনিষ্ট না হয়। ঐ কার্য্য ভালরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে শ্রেণীগুলি ধরিয়া তাহার মধ্য দিয়া দুই তিন দিন অগ্রসর যাওয়া আবশ্যক, কারণ সমস্ত গাছের tassel গুলি একই সময় বৃদ্ধি হয় না। এইরূপ শ্রেণীকে detasseled শ্রেণী বলা হয়। এইরূপে প্রত্যেক একান্তর শ্রেণীর পুং-অংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে। তাহা হইলে প্রথম শ্রেণীটা "detasseled" অর্থাৎ পুং-অংশ-কাটা, এবং তাহার পরটি অর্থাৎ "T" চিহ্নিত "tasseled শ্রেণী" অর্থাৎ পুং-অংশ-যুক্ত থাকিবে। এই "T" চিহ্নিত শ্রেণীর পুং অংশ হইতে পুষ্পরেণু ১ম শ্রেণীর গাছের স্ত্রী-অংশে (অর্থাৎ সিল্কে) পড়িয়া গর্ভ উৎপাদন করিবে, দ্বিতীয় শ্রেণীর গাছেতেও পড়িয়া থাকে। তাহা হইলে cross-breeding করা হইল। detasseled শ্রেণীর গাছের কিছু ভুট্টাকে বীজের জন্য রাখা উচিত, কারণ ঐগুলি দেখিতে ভাল, বড় ও বীর্য্যবান্।

আমেরিকার চাষারা বলেন, যিনি ভুট্টার চাষ করেন, তিনিত একজন ধনী লোক হইবেন, কারণ ভুট্টার পত্রসমূহ গৃহপালিত পশুদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য এবং ইহার দানা মানব ও পশুদের অতি পুষ্টিকর খাদ্য। কত বাণিজ্য-সংক্রান্ত দ্রব্যাদি যেমন চিনি,

সিরাপ, কর্ণ-ফ্লেক্স (যাহা ব্রেক্‌ফাষ্টের সময় খাওয়া হয়), ষ্টার্চ (যাহা রজকের বিশেষ কাজে লাগে), এল্‌কহল্‌, পইল, রং এর জন্য তৈল, রবার, কাগজ, খোসা গুলির দ্বারা গদি, জ্বালানি দ্রব্য প্রভৃতি হইয়া থাকে। বড়ই দুঃখের কথা যে, এইরূপ একটী মূল্যবান্ গাছের আদর আমাদের দেশের লোকে আমেরিকা-বাসীদের মত এখন পর্য্যন্ত করিতে শিখেন নাই।

শ্রীসত্যশরণ সিংহ।

মুষ্টিযোগ।

ঠুনকা বা স্তনে থুমকার উপায়।

শিকী অল্প উত্তপ্ত করিয়া নেকড়া ভজাইয়া স্তনোপরি রাখিলে ঠুনকা আরোগ্য হয়।

গোল মরীচ, ঘৃতকুমারী, হলুদ পোড়া ছাই, একত্রে সমভাগে লইয়া ছাগলের দুধে বাটিয়া স্তনে প্রলেপ দিলে আরোগ্য হয়।

মুসুর ডালের প্রলেপেও উপকার হইতে পারে।

স্তনের বোঁটায় ক্ষত—

সোহাগার খৈ ও গাওয়া ঘি একত্রে মাড়িয়া স্তন-ক্ষতে প্রলেপ-দিলে আরোগ্য হইবে।

"রূপটান"

অর্থাৎ স্ত্রীলোকের মুখশ্রী বৃদ্ধি করিবার উপায়—

১। "ঝুনা নারিকেলের জল"।

প্রত্যহ নারিকেলের জলে মুখ ধুইলে মুখের কালিমা, মেচেতা, ছুলি ও ব্রণ প্রভৃতি দূর হইয়া মুখের কান্তি বৃদ্ধি হয়। এমন কি ইহাতে বসন্তের দাগও মিলাইয়া যায়।

২। কাঁচা দুধে ময়দা গুলিয়া তাহাতে একটু কর্পূর দিয়া মুখে মাখিবে, পরে ধৌত করিয়া ফেলিবে। ইহাতে মুখের চর্ম্ম কোমল ও বর্ণ উজ্জ্বল হইবে।

লোমবিনাশক ঔষধ—

"বেরি সালফায়েড" ও "এরারুট"—এই দুইটী দ্রব্য এক ভাগ ও চারি ভাগে, অর্থাৎ এক ভাগ বেরি সালফায়েড ও চারি ভাগ এরারুট মিশ্রিত করিবে। পরে একটু জলে গুলিয়া লোমযুক্ত স্থানে মাখাইয়া দিবে। কিছুক্ষণ পরে ধৌত করিলে লোম সকল উঠিয়া যাইবে।

"হরিতাল" দ্বারাও অনেকে লোম উঠায়।

"সুগন্ধি নারিকেল তৈল"—

মাথার চুল ঘন ও চুলের শোভা বৃদ্ধি করিবার উপায়—

পরিষ্কার নারিকেল তৈল এক বোতল, মাথাঘষা তৈলের মশলা চূর্ণ (উৎকৃষ্ট

সুগন্ধযুক্ত মশলার আবশ্যক), চারি পয়সায় যাহা পাওয়া যায়, ক্যাষ্টারিন্ অয়েল—১০ ১২ ফোঁটা।

একত্রে মিশাইয়া বোতল সমেত রৌদ্রে রাখিবে। পরে ব্যবহার করিবে। ইহাতে চুল ঘন ও কৃষ্ণবর্ণ হইবে। চুল উঠিবে না। অথচ চুল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। টাক পড়িবার সম্ভাবনা থাকিবে না। স্ত্রী-লোকের চুলই অঙ্গের শোভা। অতএব যাহাতে স্ত্রীলোকের চুল না উঠিয়া বরং চুল ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহার চেষ্টা করা উচিত। অনেকে আতর প্রভৃতি সুগন্ধযুক্ত তৈল ব্যবহার করেন। তাহাতে চুলের উপকার নৈ অপকার হয় না। আরও এই তৈলে "মাথায় উকুন" হয় না।

বৃক্ষ।

শিক্ষা দিতে বৃক্ষ তুমি জন্মিয়াছ বিশ্বমাঝে,
হাস্যভরা আস্যখানি সুসজ্জিত পত্রসাজে।
মহাব্রতে ব্রতী তুমি সেবাব্রত ব্রতসার,
জীবনপণে জগজ্জনের সাধ উপকার।
স্বার্থতরে ব্যর্থ প্রাণ ঘৃণা কর তুমি তায়,
পরের হিতে সদাই রত উচ্চ তুমি মহিমায়।
মগ্ন তুমি শ্রেষ্ঠ ধ্যানে গর্ব্ব ত্যজি সর্ব্ব কাজে,
শিক্ষা দিতে বৃক্ষ তুমি জন্মিয়াছ বিশ্বমাঝে।
সহায়হীনা লতা যবে কাতরে তব পায়,
ভিক্ষা মাগে ঊর্দ্ধমুখে তুমি বুকে লহ তায়।
জন্মে শিরে গুল্ম তাহে হৃষ্টমনে পুষ্ট কর,
তুচ্ছ ভাবি আপন ক্ষতি মূলগুচ্ছ বক্ষে ধর।
উদার তুমি, মহৎ তুমি, জগৎভরা দান,
আশ্রিতের রক্ষা তরে বিসর্জ্জিতে পার প্রাণ
শত্রু মিত্রে নাইক ভেদ, সমান তব কাছে,
শিক্ষা দিতে বৃক্ষ তুমি জন্মিয়াছ বিশ্বমাঝে।
চন্দন তুমি পুষ্পপাত্রে, ইন্ধন তুমি রন্ধনে,
তরণী তুমি অর্ণবমাঝে, স্তম্ভ তুমি বন্ধনে,
হর্ম্ম্যের আলম্বন তুমি কুটীরের ধমনী,
আসনে বসনে তুমি ব্যাপিয়া আছ ধরণী।
আহারে বিহারে তুমি, ভেষজ তুমি ব্যাধিতে,
আহবে বিভবে তুমি—(তুমি) সকল কর্ম্ম সাধিতে।
প্রয়োজন মত তুমি লিপ্ত বিশ্বহিতে,
জন্মিয়াছ বৃক্ষ তুমি বিশ্বজনে শিক্ষা দিতে।
পল্লী যবে ঝিল্লীরবে মুখরিত নিশাভাগে,
ঘুমায় জগৎ, মাঝে মাঝে শিবা সব ডাকে।
তখন তুমি পক্ষিগণে যতনে বক্ষে ধর,
আঁধার ডাকি ঘরে নিজ আনি রক্ষা কর।
নিদাঘে তুমি পথিকগণে ছায়া কর দান,
সদ্য স্বাদু খাদ্য দানে তোষ তাদের প্রাণ।
যদিও তারা তব দেহ কাটে কুঠারঘায়,
তবুও তুমি বিতর ছায়া উচ্চ মহিমায়।
শত্রু তরে ক্ষমা-ভিক্ষা কর বিভুর কাছে,
শিক্ষা দিতে বৃক্ষ তুমি জন্মিয়াছ বিশ্বমাঝে।

শ্রীপঞ্চানন বসু।

বামারচনা।

সম্মিলন।

(১)

যা দিয়াছ প্রভো! দিয়াছ অনেক,
দীন আমি এত রাখিব কোথায়?
আমি তো তোমার, তব যা' আমার,
কেন দিলে প্রভো! এত বা আমায়?

(২)

অসার অনিত্যে রেখোনা রেখোনা
মায়া-বদ্ধ প্রাণে আরো মজাইয়ে,
মুক্ত কর চিত্ত মোহজাল হতে
নির্ব্বাণের পথ দাও দেখাইয়ে।

(৩)

ভবসুখরাশি, মরু মরীচিকা
না মিটায়ে তৃষা বাড়ায় দ্বিগুণ,
আমার প্রাণের নিবাও হে হরি!
ভবপিপাসার ভীষণ আগুন।

(৪)

আমি যাহা চাহি "শুদ্ধ নিরমল
শাশ্বত সুন্দর চির, অনশ্বর,
জীবনে মরণে নাহি যার ক্ষয়"
সদা পূর্ণ থাক্ তাহে এ অন্তর।

(৫)

তব অফুরন্ত অসীমের সনে
হোক্ লয় মম সসীম জীবন,
তোমাতে আমাতে ঘুচিয়া দূরত্ব
এক হয়ে হোক্ চিরসম্মিলন।

শ্রীহেমন্ত বালা দত্ত।

বীর-সমাধি।

অনন্ত শয়নে নিভৃত নির্জ্জনে
কে গো তুমি মহামতি?
তোমার শাসনে সুখী প্রজাগণে
হে দয়াল নরপতি!
এবে কেন হায় পড়িয়া ধরায়,
অনন্ত নিদ্রায় থির,
নিরন্ন ভিখারী রাজদণ্ডধারী
সম, কালকোলে, ওহে বীর,
রাজস্থান শোভা দীপ্ত তব প্রভা
অচল অটল ভবে,
জয়সিংহ বলী, মোগলকে ঠেলি,
শাসিতে প্রজায় সবে।
অন্তক শমন, করিয়া শাসন,
লয়ে যায় নিজে হ'রে,
স্মৃতিচিহ্ন যত, কাল কাছে হত,
থাকে না কিছুই প'ড়ে।

শ্রীমতী হে—জ দেবী।

প্রার্থনা।

হে পরম পিতা মাতা,
তুমি মোর ভগ্নী ভ্রাতা,
তুমিই আমার নাথ যথায় তথায়.
তোমার মহিমা যাহা,
কিছু নাহি জানি তাহা,
অজ্ঞান অবোধ আমি বিশাল ধরায়।

২

অন্ধ বোবা কর নাই,
নরের যা কিছু চাই
সকলি দিয়াছ নাথ নিজ দয়াগুণে।
কিন্তু এই দুঃখ হয়,
দেহ মোরে রিপু ছয়,
হৃদয় দগধ তাই হয় পাপাগুনে।

৩

এ ভবে করিতে ভোগ
দিয়াছ যে উপভোগ,
সে কেবল কর্ম্মভোগ আর বিড়ম্বনা।
মন তবু তাতে ধায়
অনলে পতঙ্গপ্রায়
মোহের ছলনে নাথ না ভাবি আপনা।

৪

তুমি প্রভো কৃপা করে
চৈতন্য না দিলে মোরে
কিরূপেতে মায়া-ডোর ছিঁড়িব আপনি,
যদিও আঁধার ঘোরে,
রাখিয়াছ নাথ মোরে,
তবু তব গুণে নাথ এই মাত্র জানি।

৫

তুমি নাথ নিরাকার,
তুমি সকলের সার,
এ বিশ্ব সংসার নাথ সকলি তোমার।
তোমারি করুণাবলে
আসি এই ধরাতলে
কত সুখ ভুঞ্জে নর নারী অনিবার।

৬

তুমি হও শিবময়,
তব করুণায় হয়
জীবের মঙ্গল সদা, জগতের স্বামী।
আমার মঙ্গল যাহা,
তুমিই করিবে তাহা,
আপন মঙ্গল কিছু বুঝি নাকো আমি।

৭

তুমি প্রভো নিজ গুণে,
উদ্ধারিও জ্ঞানহীনে,
অন্তিম কালেতে দিও চরণে শরণ।
ভক্তিভরে করি নাথ,
শত কোটি প্রণিপাত,
সদা যেন মনে থাকে তোমার চরণ।

শ্রীকুসুমলতা বসু।

---

৩৭ নং মথুরাসেনের লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 618. February, 1915

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"
কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।
স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫২ বর্ষ। ৬১৮ সংখ্যা। { মাঘ, ১৩২১। ফেব্রুয়ারী, ১৯১৫। } ১০ম কল্প। ৩য় ভাগ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক আদি ব্রাহ্মসমাজের ১১ই মাঘের সায়ংকালের উদ্বোধন।

এই প্রাঙ্গণের বাইরে বিশ্বের যে মন্দিরে সন্ধ্যাকাশের তারা জ্বলে উঠেছে, যেখানে অনন্ত আকাশের প্রাঙ্গণে সন্ধ্যার শান্তি পরিব্যাপ্ত, সেই মন্দিরের দ্বারে গিয়ে প্রণাম করতে তো মন কোন বাধা পায় না। বিশ্বভুবনে ফুলের যে রং সহজে পুষ্প-কাননে প্রকাশ পেয়েছে, নক্ষত্রলোকে যে আলো সহজে জ্বলেছে—এখানে তো সে রং লাগা সহজ হয় নি, এখানে সম্মিলিত চিত্তের আলো তো সহজে জ্বলেনি। এই মুহূর্ত্তে সন্ধ্যাকালের গন্ধগহন কুসুমের সভায়, নিবিড় তারারাজির দীপালোকিত প্রাঙ্গণে বিশ্বের নমস্কার কি সৌন্দর্য্যে কি একাগ্র নম্রতায় নত হয়ে রয়েচে! কিন্তু যেখানে দশজন মানুষ এসেছে—সেখানে বাধার অন্ত নেই—সেখানে চিত্তবিক্ষেপ কত ঢেউ তুলেচে—কত সংশয়, কত বিরোধ, কত পরিহাস, কত অস্বীকার, কত ঔদ্ধত্য! সেখানে লোক কত কথাই বলে—এ কোন্ দলের লোক, এর কি ভাষা, এ কি ভাবে, এর চরিত্রে কোথায় কি দরিদ্রতা আছে, তাই নিয়ে এত তর্ক, এত প্রশ্ন! এত বিরুদ্ধতার মাঝখানে কেমন করে নিয়ে যাব সেই প্রদীপখানি, একটু বাতাস যার সয় না—সেই ফুলের অর্ঘ্য কেমন করে পৌঁছে দেব, একটু স্পর্শেই যা ম্লান হয়। সেই শক্তি তো আমার নেই, যার দ্বারা সমস্ত বিরুদ্ধতা নিরস্ত হবে, সব বিক্ষোভের তরঙ্গ শান্ত হবে। জনতার মাঝখানে যেখানে তাঁর উৎসব, সেখানে আমি ভয় পাই—এত বিরুদ্ধতাকে ঠেলে চলতে আমি কুণ্ঠিত।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাজ-রাজেশ্বর যেখানে তাঁর সিংহাসনে আসীন, সেখানে তাঁর

চরণে উপবেশন করতে আমি ভয় করি নি। সেখানে গিয়ে বলতে পারি, হে রাজন্, তোমার সিংহাসনের এক পাশে আমায় স্থান দাও। তুমিতো কেবল বিশ্বের রাজা নও, আমার সঙ্গে যে তোমার অনন্ত কালের সম্বন্ধ। এ কথা বলতে কণ্ঠ কম্পিত হয় না, হৃদয় দ্বিধান্বিত হয় না। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে তোমাকে আমার বলে স্বীকার করতে কণ্ঠ যদি কম্পিত হয়, তবে মাপ কোরো হে হৃদয়েশ্বর! ভিড়ের মধ্যে যখন ডাক দাও, তখন কোন্ ভাষায় সাড়া দেব? তোমার চরণে হৃদয়ের যে ভাষা, সে তো নীরব ভাষা; যে স্তবগান তোমার, সে তো অশ্রুত গান। সে যে হৃদয়-বীণায় তন্ত্রে তন্ত্রে গুঞ্জিত হয়ে ওঠে —সেই বীণা যে তোমার বুকের কাছে তুমি ধরে' রেখেছ। যতই ক্ষীণস্বরে সে বাজুক্ সে তোমার বুকের কাছেই বাজে। কিন্তু তোমার আমার মাঝখানে যেখানে জনতার ব্যবধান, নীরবে হোক্ সরবে হোক্ অন্তরে অন্তরে যেখানে কোলাহল তরঙ্গিত, সেই ব্যবধান ভেদ করে' আমার এই ক্ষীণ কণ্ঠের সঙ্গীত যে জাগবে, আমার পূজার দীপালোক যে অনির্ব্বাণ হয়ে থাক্‌বে—এ বড় কঠিন, বড় কঠিন।

মানুষ গোড়াতেই যে প্রশ্ন করে, কেহে, তুমি কোন্ দলের?—এ যে উৎসব—এতো কোন এক দল নয়, এ যে শতদল। এ কাদের উৎসব—আমি কেমন করে তার নাম দেব? এক এক জন করে কত লোকের নাম বলব? হৃদয়ের ভক্তির প্রদীপ জালিয়ে সমস্ত কোলাহল পার হয়ে স্বল্পশান্ত হয়ে যাঁরা এসেছেন, আমি ত তাঁদের নাম জানি না। যাঁরা যুগে যুগে এই উৎসবের দীপ জালিয়ে গেছেন এবং যাঁরা অনাগত যুগে এই দীপ জ্বালাবেন—তাঁদের কত নাম করব, আর কেমন করেই বা করব? আমি এই জানি যে, সম্প্রদায় আপনার বাইরে আস্‌তে চায় না, সে নিজের ছাপ মেরে তবে আত্মীয়তা করতে চায়। তাঁর দক্ষিণ মুখের যে অম্লান জ্যোতি অনন্ত আকাশে প্রকাশমান, যে জ্যোতি মনুষ্যত্বের ইতিহাসের প্রবাহে ভাসমান—সম্প্রদায় সেই জ্যোতিকেই নিজের প্রাচীরের মধ্যে অবরুদ্ধ করতে চায়।

উৎসব ত ভক্তির, উৎসব ত ভক্তেরই, সে ত মতের নয়, প্রথার নয়, অনুষ্ঠানের নয়। এ চিরদিনের উৎসব, লোকলোকান্তরের উৎসব। সেই অনন্তকালের নিত্য উৎসবের আলো থেকে যে একটুখানি স্ফুলিঙ্গ এখানে এসে পড়চে—যদি কেউ হৃদয়ের দীপ-মুখে সেটুকু গ্রহণ করে, তবেই সে শিখা জ্বল্‌বে—তবেই উৎসব হবে। যদি তা না হয়—যদি কেবল দস্তুর রক্ষা করা হয়, এ যদি কেবল পঞ্জিকার জিনিষ হয়, তবে সমস্ত অন্ধকার, এখানে একটি দীপও তবে জ্বলেনি। সেই জন্য বল্‌চি এ দলের উৎসব নয়, এ হৃদয়ের ভিতরকার ভক্তির উৎসব। আমরা লোক ডেকে আলো জ্বালাতে পারি, কিন্তু লোক ডেকে তো সুধারসের উৎসকে উৎসারিত

করতে পারি না। যদি আজ কোন জায়গায় ভক্তের কোন একটি আসন পাতা হয়ে থাকে, এই সভায় কোন নিভৃত প্রান্তে যদি ভক্তের হৃদয় জেগে থাকে—তবেই সার্থক হয়েচে এই প্রদীপ জ্বালা, সার্থক হয়েচে এই সঙ্গীতের ধ্বনি, এই সমস্ত উৎসবের আয়োজন।

এ উৎসব যাত্রীর উৎসব। আমরা বিশ্বযাত্রী, পথের ধারের কোন পান্থশালাতে আমরা বদ্ধ নই। কোন বাঁধা মতামতের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে দাঁড়িয়ে থেকে উৎসব হয় না—চলার পথে উৎসব, চল্‌তে চল্‌তে উৎসব। এ উৎসব কবে আরম্ভ হয়েছে? যে দিন এই পৃথিবীতে মায়ের কোলে জন্মগ্রহণ করেচি, সেই দিন থেকে এই আনন্দ উৎসবের আমন্ত্রণ পৌঁচেছে—সেই আহ্বানে সেই দিন থেকে পথে বেরিয়েছি। সেই যাত্রীর সঙ্গে সেই দিন থেকে তুমি যে সহযাত্রী, তাইতো যাত্রীর উৎসব জমেছে। মনে হয়েছিল যে পথে চলচি সে সংসারের পথ, তার মাঝে সংসার, তার শেষে সংসার; তার লক্ষ্য ধনমান, তার অবসান মৃত্যুতে; কিন্তু না, পথ ত কোথাও ঠেকে না, সমস্তকেই যে ছাড়িয়ে যায়। তুমি সহযাত্রী, তার দক্ষিণ হাত ধরে' কত সঙ্কটের মধ্য দিয়ে সংশয়ের মধ্য দিয়ে সংগ্রামের ভিতর দিয়ে তাকে পাশে নিয়ে চলেইচ; কোনো কিছুতে এসে থাম্‌তে দাও নি। সে বিদ্রূপ করেচে, বিরুদ্ধতা করেচে—কিন্তু তুমি তার দক্ষিণ হাত ছাড়নি। তুমি সঙ্গে সঙ্গে চলেছ—তুমি তাকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছ সেই অনন্ত মনুষ্যত্বের বিরাট রাজপথে, যেখানে সমস্ত যাত্রীর দল চিরজীবনের তীর্থে চলেছে। ইতিহাসের সেই প্রশস্ত রাজপথে কি আনন্দ-কোলাহল, কি জয়ধ্বনি, সেইতো উৎসবের আনন্দধ্বনি! তুমি বদ্ধ করনি, তুমি বদ্ধ হ'তে দেবেনা, তুমি কোন মতের মধ্যে কথার মধ্যে মানুষকে নজরবন্দী করে রাখ্‌বে না। তুমি বলেছ স্বাতৈঃ—যাত্রীর দল বেরিয়ে পড়। কেন ভয় নেই, কিসে নির্ভয়? তুমি যে সঙ্গে সঙ্গে চলচ। তাই ত যে চলচে সে কেবলই তোমাকে পাচ্চে। যে চল্‌চে না সে আপনাকেই পাচ্চে, আপনার সম্প্রদায়কেই পাচ্চে।

অনন্তকাল যিনি আকাশে পথ দেখিয়ে চলেচেন, তিনি চল্‌বে ব'লে কারো জন্যে অপেক্ষা করবেন না। যে বসে রয়েচে, সে কি দেখ্‌তে পাচ্চে না তার বন্ধন—সে কি জানে না যে এই বন্ধন না খুলে ফেল্‌লে, সে মুক্ত হবে না, সে সত্যকে পাবে না? সত্যকে বেঁধেছি, সত্যকে সম্প্রদায়ের কারাগারে বন্দী করেচি, এমন কথা কে বলে! অনন্ত সত্যকে বন্দী করবে? তুমি যত বড় মুগ্ধ হওনা কেন তোমার মোহ অন্ধকারের জাল বুনিয়ে বুনিয়ে অনন্ত সত্যকে ঘিরে ফেল্‌বে এত বড় স্পর্দ্ধার কথা কোন্ সম্প্রদায় উচ্চারণ করতে পারে?

সত্যকে হাজার হাজার বৎসর ধরে' বেঁধে অচল করে রেখে দিয়েছি, এই বলে

আমরা গৌরব করে থাকি। সত্যকে পথ চল্‌তে বাধা দিয়েছি—তাকে বলেচি তোমার আসন এইটুকুর মধ্যে, এর বাইরে নয়, তুমি গণ্ডি ডিঙিয়ো না, তুমি সমুদ্র পেরিয়োনা। সত্যের অভিভাবক আমি, আমি তাকে মিথ্যার বেড়ার মধ্যে খাড়া দাঁড় করিয়া রাখ্‌ব; সুদ্ধদের জন্য সত্যের সঙ্গে মিথ্যাকে যে পরিমাণে মেশানো দরকার সেই মেশানোর ভার আমার উপর; এমন সব স্পর্দ্ধাবাক্য আমরা এত দিন বলে এসেছি। ইতিহাসবিধাতা সেই স্পর্দ্ধা চূর্ণ করবেন না? মানুষ অন্ধ জড়-প্রথার কারাপ্রাচীর যেখানে অভ্রভেদী করে তুল্‌বে এবং সত্যের জ্যোতিকে প্রতিহত করবে—সেখানে তার বজ্র পড়বে না? তিনি এ কেমন করে সহ্য করবেন? তিনি কি বল্‌তে পারেন যে তিনি বন্দী? তিনি এ কথা বল্‌লে সংসারকে কে বাঁচাবে? তিনি বলেচেন—সত্য মুক্ত, আমি মুক্ত, সত্যের পথিক তোমরা মুক্ত। এই উদ্বোধনের মন্ত্র মুক্তির মন্ত্র—এখনি নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে ধ্বনিত হচ্চে—অনন্ত কাল জাগ্রত থেকে তারা সেই জ্যোতির্ম্ময় মন্ত্র উচ্চারণ করচে—জপ করচে এই মন্ত্র সেই চিরজাগ্রত তপস্বীরা। জাগ্রত হও, জাগ্রত হও—প্রাচীর দিয়ে বাঁধিয়ে সত্যকে বন্দী করে রাখ্‌বার চেষ্টা কোরো না। সত্য তা হলে নিদারুণ হয়ে উঠ্‌বে—যে লোহার শৃঙ্খল তার হাতকে বাঁধবে, সেই শৃঙ্খল দিয়ে তোমার মস্তকে সে করাঘাত করবে।

রুদ্ধ সত্যের সেই করাঘাত কি ভারতবর্ষের ললাটে এসে পড়েনি? সত্যকে ফাঁসি পরাতে চেয়েছে যে দেশ, সে দেশ কি সত্যের আঘাতে মূর্চ্ছিত হয় নি? অপমানে মাথা হেট হয়নি? সইবে না বন্ধন—বড় দুঃখে ভাঙবে, বড় অপমানে ভাঙবে। সেই উদ্বোধনের প্রলয় মন্ত্র পৃথিবীতে জেগেচে—সেই ভাঙ্‌বার মন্ত্র জেগেচে। বসে থাক্‌বার নয়, কোণের মধ্যে তামসিকতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে থাক্‌বার নয়—চল্‌বার, ভাঙবার ডাক আজ এসেছে। আজকের সেই উৎসব—সেই সত্যের মধ্যে উদ্বোধিত হবার উৎসব।

আমরা সেই মুক্তির মন্ত্র পেয়েছি, কালের স্রোতে ডুব্‌লনা সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম—অন্তহীন সত্য, অন্তহীন ব্রহ্মের মন্ত্র। কবে ভারতবর্ষের তপোবনে কোন্ সুদূর প্রাচীন কালে এই মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল—অন্ত নেই, তাঁর অন্ত নেই—অন্তহীন যাত্রাপথে সত্যকে পেতে হবে, জ্ঞানকে পেতে হবে। সমস্ত সম্প্রদায়ের বাইরে দাঁড়িয়ে মুক্ত নীলাকাশের তলে একদিন আমাদের পিতামহ এই মুক্তির মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন—সেই যে মুক্তির আনন্দঘোষণার উৎসব সে কি এই ঘরের কোণে বসে আমরা ক'জনে সম্পন্ন করব? এই কল্‌কাতা সহরের এক প্রান্তে? ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত এই মুক্তির উৎসবের আনন্দধ্বনি বেজে উঠবে না?

এই মুক্তির বাণীকে আমাদের পিতামহ কোথা থেকে পেয়েছিলেন? এই অনন্ত আকাশের জ্যোতির ভিতর থেকে একে তিনি পেয়েছেন, বিশ্বের মর্ম্ম-কুহক থেকে এই মুক্তির মন্ত্রের ধ্বনি তিনি শুন্‌তে পেয়েছেন। এই যে মুক্তির মন্ত্র আগুনের ভাষায় আকাশে গীত হচ্চে—সেই আগুনকে তাঁরা এই ক'টী সহজ বাণীর মধ্যে প্রস্ফুটিত করেছেন। সেই বাণী আমরা ভুলব? আর বলব, সত্য পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বের ইতিহাসের জীর্ণ দেয়ালে ভাঙা ঘড়ির কাঁটার মত চিরদিনের জন্য থেমে গেছে? গৌরব করে বল্‌বে আমাদেরই দেশে সচল সত্য অচল পাথর হয়ে গেছে—বুকের উপরে সেই জগদ্দল পাথরের ভার আমরা বইচি! —না কখনই না। উদ্বোধনের মন্ত্র আজ জগৎ জুড়ে বাজ্‌চে—যাত্রী, বেরিয়ে এস, বেরিয়ে এস। ভেঙে ফেল তোমার নিজের হাতের রচিত কারাগার। সেই যাত্রীদের সঙ্গে মেল যারা চন্দ্র সূর্য্য তারার সঙ্গে এক তালে পা ফেলে ফেলে চল্‌চে।

১১ই মাঘ সন্ধ্যার উপদেশ।

আমাদের মন্ত্রে আছে—পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি—তুমি আমাদের পিতা, তুমি পিতা আমাদের এই বোধ দাও। এই পিতার বোধ আমাদের অন্তঃকরণে সজাগ নেই বলে' আমাদের যেমনি ক্ষতি হোক, পিতার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের দিক দিয়ে তাঁর কাজ সমানই চলেচে। আমাদের বোধের অসম্পূর্ণতাতে তাঁর কোন ব্যাঘাত হয়নি। তিনি তাঁর সমস্ত সন্তানের মধ্যে চৈতন্য ও প্রাণ প্রেরণ করেছেন—তাঁর পিতৃত্ব মানবসমাজে কাজ করেই চলেচে।

কিন্তু এক জায়গায় তিনি সুপ্ত হয়ে আছেন—তিনি যেখানে আমাদের প্রিয়তম, সেখানে তিনি জাগেননি। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমার প্রেম উদ্বোধিত হবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মার গভীর অন্ধকার নির্জ্জনতার মধ্যে সেই প্রিয়তম সুপ্ত হয়ে আছেন। সংসারের সকল রসের ভিতরে যে তাঁর রস, সকল মাধুর্য্য সকল প্রীতির মূলে যে তাঁর প্রীতি—এ কথা আমি জান্‌লুম না। আমার প্রেম জাগল না। অথচ তিনি যে সত্যই প্রিয়তম, এ কথা সত্য। এ বল্‌লে স্বতোবিরুদ্ধতা দোষ ঘটে; কারণ তিনি যদি প্রিয়তম তবে তাঁকে ভালবাসিনা কেন? কিন্তু তা বল্‌লে কি হবে—তিনি আমার প্রিয়তম না হলে এত বেদনা আমি পাব কেন? কত মানুষের ভিতরে জীবনের তৃপ্তির সন্ধান করা গেল, ধনমানের পিছনে পিছনে মরীচিকার সন্ধানে ফেরা গেল—মন ভরল না, সে কেঁদে বল্‌ল, জীবন ব্যর্থ হল—এমন একটি এককে পেলুম না যার কাছে সমস্ত প্রীতিকে নিঃশেষে নিবেদন করে দিতে পারি, দ্বিধা সংশয়ের হাত থেকে একেবারে নিষ্কৃতি পেতে পারি। ক্ষণে ক্ষণে এ মানুষকে ও মানুষকে আশ্রয় করলুম—কিন্তু জীবনের সেই সব প্রেমের বিচ্ছিন্ন মুহূর্ত্তগুলিকে ভরে তুলব কেমন

করে—কোন্ মাধুর্য্যের প্লাবনে ছেদগুলো সব ভরে যাবে? এমন একের কাছে আপনাকে নিবেদন করিনি বলেই এত বেদনা পাচ্ছি। তিনি যে আমার প্রিয়তম এই কথাটা জানলুম না বলেই এত দুঃখ আমার। তিনি সত্যই প্রিয়তম বলেই যা পাচ্ছি তারি মধ্যে দুঃখ রয়ে যাচ্ছে—তাতে প্রেম চরিতার্থ হচ্ছে কই? আমরা সব সন্ধানের মধ্যে এককেই খুঁজছি—এমন কিছুকে খুঁজছি যা সব বিচ্ছিন্নতাকে জোড়া দেবে। জ্ঞান কি জোড়া দিতে পারে? জ্ঞান একটা বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুকে একবার মিলিয়ে দেখে, একবার বিশ্লেষ করে দেখে। বিরোধকে মেটাতে পারে প্রেম—বৈচিত্র্যের সামঞ্জস্য ঘটাতে পারে প্রেম। বৈচিত্র্যের এই মরু ভূমির মধ্যে আমাদের তৃষ্ণা কেবলি বেড়ে উঠতে থাকে—জ্ঞান সেই বৈচিত্র্যের অন্তহীন সূত্রকে টেনে নিয়ে ঘুরিয়ে মারবে—সে তৃষ্ণা মেটাবে কেমন করে? সেই প্রেম না জাগা পর্য্যন্ত কি ঘোরাটাই ঘুরতে হয়। একবার ভাবি ধনী হই—ধনে বিচ্ছিন্নতা ভরে দেবে—সোনায় রূপায় সব পূর্ণ হয়ে যাবে।—কিন্তু সোনায় রূপায় সে ফাঁক কি ভরতে পারে? খ্যাতি প্রতিপত্তি, মানুষের উপরে প্রভাব বিস্তার—কিছু দিয়েই সেই ফাঁক ভরে না। প্রেমে সব ফাঁক ভরে যায়, সব বৈচিত্র্য মিলে যায়। মানুষ যে তার সমস্ত চেষ্টার ভিতর দিয়ে কেবলি সেই প্রেমকে খুঁজে বেড়াচ্ছে—সত্যই যে তার প্রিয়তম। —সত্য যদি প্রিয়তম না হবেন, তবে তাঁর বিরহে মানুষ কি এমন করে লুটিয়ে পড়ত? যাকে সত্য বলে আঁকড়ে ধরতে যায়, সে যখন শূন্য হ'য়ে যায়, তখন মানুষের সেই বেদনার মত বেদনা আর কি আছে? মানুষ তাই একান্তমনে এই কামনাই করচে—আমার সকল প্রেমের মধ্যে সেই একের প্রেমরস বর্ষিত হোক, আমার সব রন্ধ্র পূর্ণ হয়ে যাক। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে পাত্রের মত করে তাঁর প্রেমের অমৃতে পূর্ণ করে মানুষ পান করতে চায়। অন্তরাত্মার এই কামনা, এই সাধনা, এই ক্রন্দন। কিন্তু অহং-এর কোলাহলে এ কান্না তার নিজের কানেই পৌঁছচ্চেনা, প্রতিবারেই সে মনে করচে বড্ড ঠকেচি আর ঠকা নয়, এবার যা চাচ্ছি তাতেই আমার সব অভাব ভরে যাবে। হায়রে, সে অভাব কি আর কিছুতে ভরে! সেই বেদনা কি ভুলে থাকার উপায় আছে। এমন মোহান্ধ কেউ নেই, যার আত্মা পরম বিরহে এই বলে কাঁদছে না—প্রিয়তম জাগলেন না। ফুলের মালা টাঙানো হয়েচে, বাতি জ্বালানো হয়েচে, সব আয়োজন পূর্ণ—শুধু তাঁকে ডাকলুম না, তাঁকে জাগালুম না।

যেখানে তিনি পিতামাতা, সেখানে তিনি অন্নপান করাচ্চেন, প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখছেন। মায়ের ভাণ্ডার তো খোলা রয়েছে—ধরণীর ভোজে মা পরিবেষণ করচেন—পরিপূর্ণ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সব দিচ্ছেন। সেখানে কোন বাধা নেই।

কিন্তু যখন জগতের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করি—এত সৌন্দর্য্য কেন? এত ফুল ফুটল কেন? আকাশে এত তারার প্রদীপ জ্বলে কেন? জীবনে মাঝে মাঝে বসন্তের দক্ষিণে হাওয়া যৌবনের মর্ম্মর-ধ্বনি জাগিয়ে তোলে কেন? তখন বুঝি যে প্রিয়তম জাগলেন না—তাঁরি আগার অপেক্ষায় যে এত আয়োজন।

তাই আমি আমার অন্তরাত্মাকে যা কিছু এনে দিচ্ছি সে সব পরিহার করচে—সে বলচে এ নয়, এ নয়, এ নয়;—আমি আমার প্রিয়তমকে চাই। আমি তাঁকে না পেয়েই তো পাপে লুটচ্ছি, আমি ক্ষুধাতৃষ্ণার এই দাহ সহ্য করচি, আমি চারি দিকে আমার অশান্ত প্রবৃত্তি নিয়ে দস্যুবৃত্তি করে বেড়াচ্ছি। যাঁকে পেলে সব মিলবে তাঁকে পাওয়া হয়নি বলেই এত আঘাত দিচ্ছি। যদি তাঁকে পেতুম, বলতুম—আমার হয়ে গেছে। আমার দিনের পর দিন, জীবনের পর জীবন ভরে গেল।

সমস্ত সৌন্দর্য্যের মাঝখানে যে দিন সেই সুন্দরকে দেখলুম, সমস্ত মাধুর্য্যের ভিতরে যে দিন সেই মধুরকে পেলুম, সে দিন আমার মাধুর্য্যের পরিচয় দেব কিসে? মাধুর্য্যে বিগলিত হয়ে পরিচয় দেব? না—মাধুর্য্যের পরিচয় মাধুর্য্যে নয়, মাধুর্য্যের পরিচয় বীর্য্যে। সে দিন মৃত্যুকে স্বীকার করে পরিচয় দেব! বলব—প্রিয়তমহে, মরব তোমার জন্য। আমার আর শোক নেই, ক্ষুদ্রতা নেই, ক্ষতি নেই। প্রাণের মায়া আর আমার রইল না—বলনা তুমি, প্রাণকে তোমার কোন্ কাজে দিতে হবে? তোমাকে পেলে ধুলোয় লুটিয়ে কেঁদে বেড়াব তা নয়, কেবল মধুর রসের গান করব তা নয় গো। যে দিন বলতে পারব যিনি মধুর পরম মধুর, যিনি সুন্দর, তিনি আমার প্রিয়তম, তিনি আমায় স্পর্শ করেছেন, সে দিন আনন্দে দুর্গম পথে সমস্ত কণ্টককে পায়ে দলে' চলে' যাব। সে দিন জানব যে কর্ম্মে কোন ক্লান্তি থাকবে না, ত্যাগে কোথাও কৃপণতা থাকবে না। কোন বাধাকে বাধা বলে মানব না। মৃত্যু সে দিন সামনে দাঁড়ালে, তাকে বিদ্রূপ করে চলে' যাব। সে দিন বুঝব তাঁর সঙ্গে আমার মিলন হয়েচে। মানুষকে সেই মিলন পেতেই হবে। দেখাতে হবে দুঃখকে মৃত্যুকে সে ভয় করে না। স্পর্দ্ধা করে বীরত্ব করলে সে বীরত্ব টেঁকে না—জগৎভরা আনন্দ যে দিন অন্তরে সুধাস্রোতে বয়ে যাবে, সে দিন মানুষের সমস্ত মনুষ্যত্ব সরল হবে, তার কর্ম্ম সহজ হবে, তার ত্যাগ সহজ হবে। সে দিন মানুষ বীর। সে দিন ইচ্ছা করে সে বিপদকে বরণ করবে।

প্রিয়তম যে জাগ্‌বেন, সে খবর পাব কেমন করে? গান যে বেজে উঠবে। কি গান বাজবে? সে তো সহজ গান নয়, সে যে রুদ্র বীণার গান। সেই গান শুনে মানুষ বলে উঠবে, সৌন্দর্য্যে অভি-ভূত হব বলে' এ পৃথিবীতে জন্মাই নাই—

সৌন্দর্য্যের সুধারসে পেয়ালা ভরে তাকে নিঃশেষে পান করে মৃত্যুকে উপেক্ষা করে চলে যাব। মাধুর্য্যের প্রকাশ কেবল ললিত কলায় নয়, এই সৌন্দর্য্য সুধার মধ্যে বীর্য্যের আগুন রয়েছে—মানুষ যে দিন এই সৌন্দর্য্যসুধা পান করবে, সে দিন দুঃখের মাথার উপরে সে দাঁড়াবে, আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে। মানুষ বিষয় বিষরসের মত্ততায় বিহ্বল হয়ে সেই আনন্দরসকে পান করল না। সেই আনন্দের মধ্যে বীর্য্যের অগ্নি রয়েছে, সেই অগ্নিতেই সমস্ত গ্রহ চন্দ্রলোক দীপ্যমান হয়ে উঠেছে—সেই বীর্য্যের অগ্নি মানুষের মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তুলল না। অথচ মানুষের অন্তরাত্মা জানে যে জগতের সুধাপাত্র পরিপূর্ণ আছে বলেই মৃত্যু এখানে কেবলি মরছে এবং জীবনের ধারাকে প্রবাহিত করচে—প্রাণের কোথাও বিরাম নেই। অন্তরাত্মা জানে যে সেই সুধার ধারা জীবন থেকে জীবনান্তরে, লোক থেকে লোকান্তরে বয়েই চলেচে—কত যোগী, কত প্রেমী, কত মহাপুরুষ সেই সুধার ধারায় সমস্ত জীবনকে ডুবিয়ে অমৃতত্বের সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে ডাক দিয়ে বলেছেন—তোমরা অমৃতের পুত্র, মৃত্যুর পুত্র নও।

কিন্তু সে কথায় মানুষের বিশ্বাস হয় না। সে যে বিষয়ের দাসত্ব করেচে, সেইটেই তার কাছে বাস্তব—আর এ সব কথা তার কাছে শূন্য ভাবুকতা মাত্র। সে তাই এ সব কথাকে বিদ্রূপ করে, আঘাত করে, অবিশ্বাস করে। যাঁরা অমৃতের বাণী এনেচেন, মানুষ তাই তাঁদের মেরেচে। তাঁরা যেমন মানুষের হাতে মার খেয়েছেন, এমন আর কেউ নয়, অথচ তাঁরাত ম'লেন না। তাঁদের প্রাণই শত সহস্র বৎসর ধরে সজীব হয়ে রইল। কারণ তাঁরাই যে মার খেতে পারেন; তাঁরা যে অমৃতের সন্ধান পেয়েছেন। মৃত্যুর দ্বারা তাঁরা অমৃতের প্রমাণ করেন। মানুষের দরজায় এসে দাঁড়ালে মানুষ তাঁদের আতিথ্য দেয়নি, আতিথ্য দেবে না—মানুষ তাঁদের শত্রু বলে জেনেছে। কারণ আমরা আমাদের যত কিছু মত বিশ্বাস সমস্ত পাথরে বাঁধিয়ে রেখে দিয়েচি, ঐ সব পাগলকে ঘরে ঢোকালে সে সমস্ত যে বিপর্য্যস্ত হয়ে যাবে, এই মানুষের মস্ত ভয়। মৃত্যুকে কৌটার মধ্যে পুরে লোহার সিন্দুকে লুকিয়ে রেখে দিয়েচি, ওরা ঘরে এলে কি আর রক্ষা আছে—লোহার সিন্দুক ভেঙে যে মৃত্যুকে এরা বার করবে।

সেই মৃত্যুকেই তাঁরা মারতে আসেন। তাঁরা মরে প্রমাণ করেন আছে সুধা সমস্ত বিশ্বকে পূর্ণ করে,—নিঃশেষে পরম আনন্দে সেই সুধার পাত্র থেকে তাঁরা পান করেন। তাঁরা প্রিয়তমকে জেনেছেন, প্রিয়তম তাঁদের জীবনে জেগেছেন।

আমাদের গানে তাই আমরা ডাকচি—প্রিয়তমহে, জাগ জাগ জাগ। কেননা, প্রিয়তমহে তুমি জাগনি বলেই মনুষ্যত্ব

বিকাশ হ'ল না, পৌরুষ পরাহত হয়ে রহিল। তোমার কণ্ঠের বিজয়মালা দাও পরিয়ে তুমি আমাদের কণ্ঠে—জয়ী কর সংগ্রামে। সংসারের যুদ্ধে পরাভূত হ'তে দিওনা—বাঁচাও, তোমার অমৃতপাত্র আমাদের মুখে এনে দাও। অপমানের মধ্যে, পরাভবের মধ্যে তোমাকে ডাকৃছি—জাগ, জাগ, জাগ। জাগরণের আলোকে সমস্ত দেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠুক্।

(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত)

বর্ত্তমান বঙ্গীয় মহিলাসমাজের শিক্ষা—তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ ও বিস্তারের প্রকৃষ্ট উপায়।*

মহিলাদিগকে উপযুক্তরূপে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনেকেই উপলব্ধি করিতেছেন। তবে এক সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা বলেন যে—মহিলাদিগকে শিক্ষা দিলে তাঁহাদিগের শারীরিক ক্ষতি হয়। বিদ্যালাভের জন্য মস্তিষ্কের পরিচালনা অনিবার্য্য। নারীগণের মস্তিষ্কের আত্যন্তিক আলোচনার জন্য উহার বিশেষ ক্ষতি হয়। ঐ ক্ষতি পূরণের জন্য নারীর অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে রক্তাদি মস্তিষ্কে প্রেরিত হয়। অর্থাৎ নারীগণের অন্যান্য অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত না হইলে তাঁহাদের মস্তিষ্ক পরিপুষ্ট হয় না। এই শ্রেণীর লোকদিগের মত যে কত দূর সমীচীন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে দেশের অধিকাংশ ব্যক্তিই যে স্ত্রী-শিক্ষার উপযোগিতা স্বীকার করিতেছেন, তাহা অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিতে হইবে। তবে কি প্রণালীতে শিক্ষা প্রদত্ত হইবে ইহা লইয়া এক এক জন এক এক প্রকার মত প্রকাশ করেন। কেহ বলেন প্রাচ্য ভাবে শিক্ষা প্রদত্ত হউক, কেহ বলেন পাশ্চাত্য ভাবে শিক্ষা প্রদান করা হউক। আবার কেহ বলেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনে শিক্ষা দান করা হউক। পাশ্চাত্য আদর্শ গ্রহণ সম্বন্ধে কোন কোন ব্যক্তি বলেন যে পূর্ব্বে আমাদের দেশে মহিলাগণের শিক্ষার কোন সুব্যবস্থা ছিল না। সেই জন্য আদর্শ গ্রহণ করিতে হইলে বর্ত্তমান সভ্যতার শীর্ষস্থান পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষাকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করা উচিত। আমাদিগের বক্তব্য বিষয়ের বিষয়ীভূত না হইলেও আমরা এস্থলে উদাহরণ-স্বরূপ দেখাইব যে, পূর্ব্বে আমাদের দেশে স্ত্রী শিক্ষা ছিল।

প্রাচীন ভারতে স্ত্রীশিক্ষা।

আমাদের দেশে যে পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোকদিগকে উপযুক্তরূপে শিক্ষিত করা হইত,

* সুকুমার সম্মিলনীর বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

তাহার প্রমাণ বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তখন ভারত মহিলাগণ যে গণিত, দর্শন, সাহিত্য, অন্যান্য-বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতিতে বিশেষরূপে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। লীলাবতী, গার্গী, দেবাহুতি, মদালসা, মৈত্রেয়ী, লোপামুদ্রা প্রভৃতি বিদুষী রমণীগণ প্রাচীন কালে উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। বেদের অনেক মন্ত্র ঋষিপত্নীগণের প্রণীত। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ ভাস্করাচার্য্যের কন্যা লীলাবতী পুত্রবৎ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গর্গ-মুনির কন্যা গার্গী (মতান্তরে পত্নী) যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত শাস্ত্রালোচনায় যশোভাজন হইয়াছিলেন। জনকের রাজসভায় তাঁহার বিচার-পাণ্ডিত্য প্রশংসনীয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী মৈত্রেয়ীর জ্ঞান-গবেষণার পরিচয় আছে। তাঁহার প্রশ্ন ও যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর হিন্দু-মহিলার জ্ঞান-স্ফূর্ত্তির প্রকৃষ্ট নিদর্শন। প্রাচীন কালে স্ত্রীশিক্ষা ছিল, কিন্তু তাহার প্রণালী কিরূপ ছিল তাহা বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে প্রাচীন গ্রন্থাদি পাঠে আভাস পাওয়া যায় যে, স্ব স্ব গৃহেই মহিলাদিগকে শিক্ষা প্রদত্ত হইত।

বৌদ্ধ যুগে স্ত্রীশিক্ষা।

ইহার পর বৌদ্ধ যুগেও স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত ছিল। তবে পৌরাণিক যুগ হইতে আদর্শ কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকারের হইয়াছিল। যাহা হউক, কি প্রাচীন যুগ, কি বৌদ্ধযুগ—এই উভয় যুগেই শিক্ষার মূল বিষয় ছিল ধর্ম্ম-শিক্ষা। প্রাচীন বিদুষীদিগের কাহিনী আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই—কেহ পতিসেবার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, কেহ সন্তানপালনের উচ্চাদর্শ সম্মুখে ধরিয়া রাখিয়াছেন, কেহ ভগবদ্ভক্তিতে মাতোয়ারা হইয়াছেন, কেহ বা পাণ্ডিত্যালোকে জগৎকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন। মূলতঃ মহিলাদিগের প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থায় ভারত যে প্রসিদ্ধ ছিল, তাহা চিরকাল সকলকে অবনত মস্তকে স্বীকার করিতে হইবে। গৌতম-বুদ্ধের জীবনচরিত আলোচনা করিলেও দেখিতে পাই যে, মহিলাগণ তাঁহার সদুপদেশ লাভ করিয়াছিলেন এবং অনেক জ্ঞানগরিমার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। কোন কোন পাশ্চাত্য মনীষী বলেন যে, ভারতের স্ত্রীলোকগণ কখন শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত হন নাই। ইঁহাদিগের সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, হয় তাঁহারা প্রাচীন-ভারত-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ অথবা সত্যকে লুক্কায়িত রাখিবার জন্য বদ্ধপরিকর।

মুসলমান যুগে স্ত্রীশিক্ষা।

বৌদ্ধযুগের পর মুসলমান যুগের আরম্ভ। মুসলমানেরা সাধারণতঃ জ্ঞানান্বেষী ছিলেন না। তাঁহারা হিন্দুদিগের পুস্তকালয় প্রভৃতি পাইলেই অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিতেন। তাঁহাদিগের সময়ে অবরোধ-প্রথার অত্যধিক প্রচলন হইয়াছিল।

আইন-ই-আকবরী নামক প্রসিদ্ধ

গ্রন্থে দেখা যায় যে, বাদসাহের অন্তঃপুরে শিক্ষার প্রচলন ছিল। জাহানারা, রোষেনারা প্রভৃতি অল্প বিস্তর শিক্ষিতা ছিলেন। অবরুদ্ধ থাকিলে শিক্ষা কিছুতেই প্রকৃষ্টরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। এই জন্য তাৎকালিক মহিলাদিগকে শিক্ষা প্রদান করা হইত না, হইলেও তাহা অনুল্লেখযোগ্য।

মুসলমান রাজত্বের শেষাবস্থা।

ইহার পরে ক্রমে ক্রমেই স্ত্রীশিক্ষার অবনতি হইতে লাগিল। অবশ্য এ অবনতির মূলে যে কিছু কুসংস্কার ছিল না তাহা নহে। এই যুগেও যে দুই চারিজন শিক্ষা লাভ করে নাই, তাহা নহে; তবে এই বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে দুই চারি জনের শিক্ষা – শিক্ষাই নহে। এরূপ শিক্ষা জাতীয় উন্নতির কিঞ্চিন্মাত্রও সাহায্য করে না। যে শিক্ষার ভাব-প্রবণতা হয়, যে শিক্ষা দ্বারা হৃদয় উন্নত হয়, তাহাই শিক্ষা।

ইংরাজাধিকার।

মুসলমানদিগের অধঃপতনের পরে ইংরাজাধিকার। ইংরাজাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে আবার স্ত্রীশিক্ষা প্রদানের চেষ্টা আরম্ভ হয়। এ চেষ্টার মূলে ইংরাজ গভর্ণমেন্ট। অবশ্য ইহার উদ্যোগী অনেক মহাত্মাই ছিলেন। ডফ সাহেব, রাজা রামমোহন রায়, রাম গোপাল ঘোষ, প্যারিচাঁদ মিত্র, বেথুন সাহেব ও বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি। তাঁহাদিগের উদ্যম, চেষ্টা ও উৎসাহের ফলে দেশে আবার স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন হইল। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ তৈল পাইয়া যেরূপ জ্বলিয়া উঠে, অথবা স্তিমিতপ্রায় অগ্নি ইন্ধন পাইয়া যেরূপ লোলজিহ্বা বিস্তার করে, সেইরূপ মৃতপ্রায় স্ত্রীশিক্ষা আবার উঠিয়া বসিল। তাহার শরীরে উৎসাহ-রক্ত প্রবাহিত হইয়া যেন তাড়িতের ন্যায় কার্য্য করিল। দেশের নানা স্থানে নিম্ন ও উচ্চ বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইল।

বর্ত্তমানে বঙ্গীয় মহিলাসমাজের শিক্ষা ও তাহার সমালোচনা।

বর্ত্তমান সময়ের মহিলাসমাজ সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ শিক্ষিতা মহিলা; শিক্ষিতা মহিলা বলিলে বুঝিতে হইবে, যাঁহারা উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগের দেশের মুখোজ্জ্বল করিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ অর্দ্ধ-শিক্ষিতা; অর্দ্ধ শিক্ষিতা বলিলে যে সকল বালিকা স্কুলে সাধারণতঃ পাঠ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে বুঝিতে হইবে। আমাদের দেশে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত বলিয়া প্রায় তের বা চৌদ্দ বৎসরেই বালিকাদিগের বিবাহ হইয়া যায়। বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদিগের স্কুলের পাঠ বন্ধ হইয়া যায়, শ্বশুরালয়ে সাধারণতঃ পাঠের সুযোগ হয় না। তৃতীয়তঃ অশিক্ষিতা; ইহা ভদ্র ও অভদ্র, ধনী ও নির্ধন সকল গৃহেই বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা সকলেই অশিক্ষিতা। ভদ্র গৃহের মধ্যে প্রায়শঃ গ্রাম্য বালিকারাই অশিক্ষিতা হইয়া থাকে। ভদ্র-গৃহে অশিক্ষিতার অবস্থানের প্রধান কারণ, গ্রামে শিক্ষা প্রদানের অসুবিধা। অবশ্য

কোন কোন গৃহে অভিভাবকগণের অবহেলাও অন্যতম কারণরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। এক্ষণে আমরা উচ্চশিক্ষিতা ও অর্দ্ধশিক্ষিতাগণের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষা-প্রণালীর যে প্রভূত পরিমাণে উন্নতি হইয়াছে তাহার কোনও সন্দেহ নাই। তবে এই শিক্ষা যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিক্ষা, তাহা একবাক্যে স্বীকার করিতে পারা যায় না। অবশ্য বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীমতে শিক্ষিতা হইয়া অনেক বঙ্গের গৌরবাস্পদা বিদুষী মহিলা প্রতি বৎসরই এম্, এ, ও বি, এ, প্রভৃতি পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণা হইতেছেন, কিন্তু তবুও বলিব এ শিক্ষা আদর্শ-শিক্ষা নহে। এক দিক দিয়া দেখিলে এই শিক্ষায় কতক পরিমাণে উপকার হইতেছে, আবার অপর দিক দিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহাতে অপকারেরও সম্ভাবনা আছে।

(১) বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষা পুরুষদিগের শিক্ষার অনুরূপ। এই শিক্ষায় পুরুষ ও স্ত্রীলোক একই ভাবে শিক্ষিত হয়। এই শিক্ষার অনেক গুণ থাকিলেও ইহা দ্বারা রমণীসুলভ কোমল গুণগুলি হইতে বালিকাদিগকে বঞ্চিত হইতে হয়। আমাদিগের মতে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা পুরুষদিগের শিক্ষা হইতে বিভিন্ন প্রকারের হওয়া উচিত।

(২) বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী পাশ্চাত্যরীতি-সম্মত। এক্ষণে বিবেচ্য যে, আমাদিগের দেশে নারীগণকে ঠিক পাশ্চাত্য ভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত কি না? অবশ্য পাশ্চাত্য-ভাবসম্মত শিক্ষার ঔচিত্য ও অনৌচিত্য সম্বন্ধে অনেকেরই মতদ্বৈধ হইবার সম্ভাবনা। তথাপি আমরা সংক্ষেপে কয়েকটী যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা আমাদিগের মত সমর্থন করিতে চেষ্টা করিব।

আমাদিগের মতে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষা প্রদত্ত হওয়া উচিত নহে। দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনায়, জলবায়ুর তারতম্যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে অনেক প্রভেদ। অতএব পাশ্চাত্যের যাহা আদর্শ, প্রাচ্যেরও ঠিক সেই আদর্শ হওয়া সঙ্গত নহে। সাধারণতঃ পাশ্চাত্য দেশে বেলা দশম ঘটিকা হইতে অপরাহ্ণ চারি ঘটিকা পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ের কার্য্য হইয়া থাকে। পাশ্চাত্যের আদর্শে আমাদিগের দেশেও তাহাই হইতেছে। পাশ্চাত্য দেশ শীত প্রধান, প্রাচ্যদেশ গ্রীষ্ম-প্রধান। পাশ্চাত্য দেশে প্রাতঃকালে এত অধিক পরিমাণে শৈত্যানুভব হয় যে, তখন কেহ বড় অধিক কার্য্য করিতে পারে না। শীতকালে অনেক সময় বরফ ও বৃষ্টিপাত হইতে থাকে। পাশ্চাত্য-দেশবাসিগণ গগনমার্গে সূর্য্য উদিত হইতে দেখিলে অত্যধিক আনন্দিত হয়। আমাদিগের দেশের বালক-বালিকাগণ কোন আশ্চর্য্য পদার্থের নাম শুনিলে তাহা দেখিবার জন্য যেরূপ কৌতূহলী হইয়া সেই দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ পাশ্চাত্য দেশবাসিগণ "সূর্য্য উঠিয়াছে" এই কথা শ্রবণ করিলেই

আকাশের দিকে, হর্ষোৎফুল্ল, অনুসন্ধিৎসু নেত্রে চাহে। গরম না হইলে তদ্দেশবাসিগণ জীবিত থাকিতে পারে না, সেই জন্য তাহারা গরম ভালবাসে। সেই জন্য তাহারা গরম বস্ত্র পরিধান করে, উত্তাপজনক খাদ্য আহার করে। এমন কি তাহাদের ভাষাও তেজোময়। সে দেশে ভাল ভাবে অভ্যর্থনা করিলে বলে Warm Reception, তাঁহারা আপনাদিগের দেশের স্বাস্থ্যনীতির যাহা অনুকূল তাহাই করেন। কিন্তু আমাদিগের গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। পূর্ব্বে আমাদিগের দেশে প্রাতঃকালে ও বৈকালে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা প্রচলিত ছিল। পূর্ব্বের মুনি-ঋষিগণ পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে বৃক্ষের শীতল ছায়ায় উপবেশন করিয়া অধ্যাপনা করিতেন। তক্ষশিলা নালন্দা প্রভৃতি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা কার্য্যও পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে হইত। সেই সময়ের অধ্যাপনার কথা মনে করিলেও আনন্দে হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠে। আমাদিগের দেশে প্রাতঃকালে ও বৈকালে বায়ু শীতল থাকে, সেই জন্য মস্তিষ্কও শীতল থাকে। এই সময় গুরু ও শিষ্য উভয়েরই মন প্রফুল্ল থাকে। অতএব অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা উভয়ই ভাল হয়। আমাদিগের আয়ুর্ব্বেদে উল্লিখিত আছে যে, মধ্যাহ্নসময়ে আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিবে, কায়িক অথবা মানসিক কোন প্রকার পরিশ্রমের কার্য্য করিবে না। প্রাতঃকালে ও বৈকালে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে। বাস্তবিক এই গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে মধ্যাহ্নসময়ে, সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে ত্রাহি ত্রাহি রব করিতে হয়, সে সময়ে কিছুতেই অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা হইতে পারে না। আমাদিগের প্রকৃতি অনুসন্ধান করিতে হইলে ভাষার দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে, যেহেতু যে জাতি যে প্রকৃতির, সেই জাতির ভাষাও সেই প্রকৃতির। আমাদিগের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা—অতিশয় ঠাণ্ডা ভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষা শ্রুতিমধুর, অনায়াসে পাঠ করা যায় এবং ইহাতে স্থায়ী সৌম্যভাব বিরাজমান। বাঙ্গালী সাধারণতঃ শীতলতা-প্রয়াসী। অতএব আমাদিগের দেশে মধ্যাহ্নকালে বিদ্যালয়ের কার্য্য হওয়া উচিত নহে। প্রাতঃকালে ও বৈকালেই আমাদিগের দেশে বিদ্যালয়ের কার্য্য হওয়া উচিত—ইহাই আমাদিগের স্বাস্থ্যনীতির অনুকূল। পাশ্চাত্যদেশে শরীর গরম রাখিবার জন্য লোকে উষ্ণবীর্য্য মদ্য পান করে, আমাদিগের দেশে শরীর শীতল করিবার জন্য ডাব, সরবৎ প্রভৃতি পান করে। অতএব প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে প্রভেদ অনেক। আমাদিগের প্রাচ্য-শিক্ষা শান্তরসের আধার, আর পাশ্চাত্যের শিক্ষা তেজস্কর রুদ্ররসের আধার। আমাদিগের প্রাচ্যশিক্ষা চন্দ্রালোকের ন্যায় স্নিগ্ধ, আর পাশ্চাত্যের শিক্ষা নিদাঘের খররবিকর সদৃশ।

৩। ধর্ম্মশিক্ষা।

আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষা

ধর্ম্মোপদেশশূন্য। সকল দেশের সকল জাতির মধ্যেই ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা আছে, নাই কেবল আমাদিগের—বাঙ্গালী জাতির। ধর্ম্মশিক্ষার অভাব আমরা পদে পদে অনুভব করিতেছি। ধর্ম্মশূন্য শিক্ষায় বাঙ্গালার বালকবালিকাগণ ধর্ম্মে আস্থা-শূন্য হইতেছে ও নীতি-বাক্যের অনুসরণ করিতেছে না। ক্রীশ্চানদিগের বাইবেল পড়াইবার ব্যবস্থা আছে, মুসলমানদিগের কোরান পড়াইবার ব্যবস্থা আছে,—নাই কেবল হিন্দুর—বাঙ্গালীর। ধর্ম্মশূন্য শিক্ষা শিক্ষাই নহে, সে শিক্ষা অধঃপতনের মূল। ভারতবাসিগণ, তথা হিন্দুগণ, পূর্ব্বে বরাবরই ধর্ম্ম প্রাণ ছিলেন। চীন-পরিব্রাজক হিউয়েন সাং বলিয়াছিলেন—"The Indians are distinguished by their straight-forwardness and honesty of their character."

চীন-দূত সাংখাই বলিতেছেন—"The Indians are straight forward and honest."

ফ্রায়ার জড়ডেনাস বলিয়াছেন—"The people of India are true in speech and eminent in justice."

ইদরিশি বলিয়াছেন—"The Indians are naturally inclined to justice, and never depart from it in their actions. Their good faith, honesty and fidelity to their engagements are well known, and they are so famous for these qualities that people flock to their country from every side. (Elliot's History of India Vol. 1. P. 88.)

আরও কত শত পাশ্চাত্য মনীষী ভারত-বাসিগণের ধর্ম্মপ্রাণতার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বাহুল্য-বোধে আর উল্লেখ করিলাম না। যাহা হউক যাহাতে আমাদিগের দেশে ধর্ম্মশিক্ষার পুনঃ প্রচলন হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত।

(ক্রমশঃ)

বারাণসী-তত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তৃতীয় অধ্যায়।

নদী-সম্মুখস্থ দশাশ্বমেধ ঘাট।

ভেলুপুরার পরই অনেক ঘাটরাজী এবং সুবৃহৎ হর্ম্ম্যাবলী আমাদিগের নয়ন-পথে পতিত হয়। বারাণসী ধামের অনেক সুপ্রসিদ্ধ সুরম্য অট্টালিকা এইখানেই বিরাজমান। প্রথম বাটীটী কাকুইনিবাসী পেশোয়াবংশাবতংস অমৃত রাওয়ের। ইহাতে সত্র থাকাতে ইহার অন্য একটী নাম সত্রঘাট। ইহারই সংলগ্নীভূত মুনেশ্বর ঘাট, গঙ্গামহল ঘাট, খোরী ঘাট এবং চৌসথী ঘাট। বাঙ্গালী টোলায় অবস্থিত

চৌসথী দেবীর সুবৃহৎ মন্দিরের নামে শেষোক্ত ঘাটটীর নামকরণ হইয়াছে। অতঃপর পাণ্ডে-ঘাট, রাণাঘাট এবং মুন্সিঘাট। শেষোক্ত ঘাটটি প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যাবাইয়ের রাজমিস্ত্রী মুন্সি শ্রীধর দ্বারা নির্ম্মিত। অবশ্যই বলিতে হইবে যে, অহল্যাবাই বারাণসীধামের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য যে প্রকার প্রয়াস পাইয়াছিলেন সেরূপ অন্য কেহ পান নাই। অতঃপর শীতলা ঘাটের উচ্চমঞ্চ-সংলগ্ন দশাশ্বমেধ ঘাট। এই স্থান হইতে তুরারোহ সোপানাবলী নগরমধ্যগত বড় রাস্তায় যাইয়া মিলিত হইয়াছে। প্রবাদ এইরূপ যে, এখানে ব্রহ্মা অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নানের বড়ই ধুম, বিশেষতঃ গ্রহণের সময়। দশাশ্বমেধ ঘাটটী পঞ্চতীর্থের মধ্যে একটী তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। অপর চারিটি তীর্থের নাম:(১) অসিসঙ্গম (২) মণিকর্ণিকা (৩) পঞ্চ-গঙ্গা এবং (৪) বরুণা-সঙ্গম। তীর্থ যাত্রিগণ প্রথমে অসি-সঙ্গম অথবা অসিঘাটে আগমন করিয়া পুণ্য-কার্য্যাদি করেন, পরে দশাশ্বমেধ ঘাটে গমন করিয়া থাকেন। এখান হইতে মণিকর্ণিকায় সমাগত হইয়া স্নান-কার্য্য সমাপন করেন ও সর্ব্বশেষে পঞ্চগঙ্গা এবং বরুণাসঙ্গমে প্রয়াণ করেন। উল্লিখিত স্থান-পঞ্চক পঞ্চতীর্থ নামে খ্যাত। দশাশ্বমেধ সম্বন্ধে জনশ্রুতি আছে যে, একদিন মহাদেব গৌরীর সহিত মন্দরাচলে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় বারাণসী ক্ষেত্রের কোন সংবাদ না পাওয়াতে মহাদেবের মন বিচলিত হইল। তখন বারাণসী ধাম রাজা দিবোদাসের অধীনে ছিল। তিনি দেবগণকে স্বীয় রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া বেনারস নগরীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন। যদিও মহাদেব বেনারসের সংবাদের জন্য অনেক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, তথাপি কেহই সংবাদ লইয়া প্রত্যাগত হয় নাই। সকলেই বেনারসের শোভা-সন্দর্শনে বিমোহিত হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিল। চিন্তা করিতে করিতে তিনি ব্রহ্মাকে স্মরণ করিলেন। অমনি ব্রহ্মা কৃতাঞ্জলিপুটে তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন মহাদেব ব্রহ্মাকে আজ্ঞা করিলেন, তুমি বেনারসে যাইয়া রাজা দিবোদাসকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিবার উপায় দেখ। ব্রহ্মা মহাদেবকে প্রণাম করিয়া বেনারস অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কাশীর রমণীয়তা দেখিয়া ব্রহ্মাও মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তিনি মন্দির, বিপণী, ঘাট প্রভৃতি সর্ব্বত্রই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিলেন, কিছুই বাদ রহিল না। পরিশেষে তিনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ পরিগ্রহ করিয়া রাজসন্নিধানে গমন করিলেন। রাজার নিকটে ব্রাহ্মণের সৎকারের কিছু ত্রুটি হইল না। ছদ্মবেশী ব্রহ্মা কহিলেন, "আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং আমি কিছুই লইব না।" উভয়ের বাক্যালাপের সময় ব্রহ্মা চিন্তা করিতে লাগিলেন, যদি কোনরূপে রাজাকে সামান্য পাপ কার্য্য করাইতে পারেন, তবে তাঁহার

রাজ্যচ্যুতি সম্ভব হইতে পারে,নতুবা নহে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি রাজাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'রাজন্! আমি একটি যজ্ঞ করিতে বাসনা করিয়াছি, যদি আপনি কিছু দিতে উৎসুক হন, তবে আমাকে যজ্ঞসামগ্রী দিন।' রাজাও প্রতিশ্রুত হইলেন। ব্রহ্মা গঙ্গাতটে যাইয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার ধারণা এই ছিল যে, রাজা যজ্ঞসামগ্রী দিতে কিছু না কিছু ভুল করিবেন, আর সেই পাপে তাঁহার রাজ্যচ্যুতি সঙ্ঘটিত হইবে। যজ্ঞ-সামগ্রীও অদ্ভুত. যথা ২৭ কূপের জল, ২৭ বৃক্ষের পত্র এবং অন্যান্য বস্তুও এই প্রকার ২৭গুণ। রাজা ছদ্মবেশী ব্রহ্মাকে কহিলেন 'আপনি এক যজ্ঞের কামনা করিয়াছেন, আমি আপনাকে দশ যজ্ঞের সামগ্রী পাঠাইয়া দিতেছি।' ব্রহ্মাও তদ্বাক্যশ্রবণে পরিতুষ্ট হইলেন। কিছুক্ষণ পরেই যজ্ঞের সম্ভার আসিল—কোন বিষয়ের ত্রুটি রহিল না। ব্রহ্মা বিস্মিত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। এই যজ্ঞে দশ অশ্বের আহুতি প্রদত্ত হয়। তদবধি এই স্থানটী দশাশ্বমেধঘাট নামে খ্যাত। ব্রহ্মা এইখানে দুইটী মূর্ত্তি স্থাপিত করেন। তন্মধ্যে একটি মহাদেবের—ইহা দশাশ্ব-মেধেশ্বর নামে খ্যাত এবং অপরটী ব্রহ্মে-শ্বর নামে প্রসিদ্ধ। প্রথম মূর্ত্তিটি কৃষ্ণ-প্রস্তর-নির্ম্মিত এবং অপর মূর্ত্তি হইতে বৃহৎ। হিন্দুগণের বিশ্বাস যে, দশাশ্ব-মেধেশ্বরের পূজা করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না, পূজকের আত্মা স্বর্গে গিয়া শিব-সকাশে বাস করে। ব্রহ্মেশ্বরের পূজায় ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে দশাশ্বমেধ ঘাটে এবং নিকটবর্ত্তী রুদ্ররস-নামক সরোবরে বহু ব্যক্তি স্নান করিয়া থাকে। স্নান এবং পূজার ধুম ১৫ দিন পর্য্যন্ত থাকে।

দশাশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন করিয়া ব্রহ্মা দেখিলেন যে, রাজাকে কোন প্রকার পাপ অর্শিল না। এখন তিনি বিষম সমস্যায় পতিত হইলেন। মহাদেবের নিকটে কি করিয়াই বা ফিরিবেন। এই চিন্তাই তাঁহার বলবতী হইল। এদিকে নগরের রমণীয়তাও তাঁহার মন আকৃষ্ট করিল। ফলে এই হইল যে, ব্রহ্মা কাশীতেই বাস করিতে লাগিলেন।

দশাশ্বমেধ ঘাটের পরই আর একটী প্রসিদ্ধ ঘাট আছে, উহা মানমন্দির ঘাট নামে খ্যাত। ১৬৯৩ খৃঃ জয়পুরের রাজা জয়সিংহ এই স্থানটী প্রতিষ্ঠিত করেন। উক্ত রাজার বংশধরগণ অধুনা সমগ্র মহল্লার মালিক। মানমন্দির নদীর উপরই বিরাজিত। কিন্তু দুঃখের মধ্যে ভগ্নদশা প্রাপ্ত। বিশেষ বিশেষ শিল্প সমন্বিত বড় বড় যন্ত্রাদি দিল্লী, মথুরা, উজ্জয়িনী এবং জয়পুর হইতে আনীত হইয়া মানমন্দিরে রক্ষিত হইয়াছে। তন্মধ্যে অনেক যন্ত্রই এখন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। প্রবাদ এইরূপ যে, রাজা জয়সিংহের পূর্ব্বপুরুষ এবং সম্রাট আকবরের প্রসিদ্ধ সেনাপতি রাজা মান-সিংহ এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু

অনেকের অনুমান এই যে, রাজা জয়সিংহ স্বীয় প্রসিদ্ধ জনকের স্মৃতিরক্ষার্থ তাঁহার নামে মান-মন্দিরের নামকরণ করিয়াছেন। মান মন্দিরে যে সকল যন্ত্রাদি আছে, তন্মধ্যে প্রধান প্রধান যন্ত্রের নাম, যথাঃ—

(১) ভিত্তিযন্ত্র—ইহা দ্বারা সূর্য্যের নিম্নগতি এবং অক্ষ জানিতে পারা যায়।

(২) যন্ত্রসম্রাট—ইহা দ্বারা উত্তর মেরু দেখা যায়। ইহাতে একটী শঙ্কু আছে, উহা সূর্য্য-ঘটিকার কার্য্য করিয়া থাকে।

(৩) সূর্য্যঘটিকার নিকট একটী ক্ষুদ্র ভিত্তিযন্ত্র অবস্থিত।

(৪) ক্ষুদ্র ভিত্তিযন্ত্রের পূর্ব্ব দিকে প্রস্তর-নির্ম্মিত একটী বিষুবরেখা বৃত্ত আছে।

(৫) পূর্ব্বদিকে আর একটী ক্ষুদ্র সূর্য্য-ঘড়ি অবস্থিত।

(৬) উক্ত সূর্য্যঘড়ির সন্নিকটে চক্রযন্ত্র নামে একটী লৌহনির্ম্মিত চক্র দুইটী দেওয়ালের মধ্যে ঘুরিতেছে, তদ্দ্বারা উত্তর মেরু দেখা যায়। ইহা দ্বারা সমগ্র গ্রহ উপগ্রহের নিয়তা উপলব্ধি হইয়া থাকে। যন্ত্রটীর কতকগুলি অঙ্গ নাই।

(৭) ইহার পূর্ব্ব দিকে একটী দিগ্রাংশ যন্ত্র আছে।

মানমন্দিরের অনতিদূরে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত নেপালী-মন্দির অবস্থিত। ইহা নেপালের রাজবংশ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত। অতঃপর মীরঘাট। ইহার সোপানাবলী অত্যন্ত অপ্রশস্ত। বলবন্ত সিংহের পূর্ব্বে মীর রুস্তম আলী নামে জনৈক শাসনকর্ত্তা দ্বারা এই ঘাট নির্ম্মিত হয়। ঘাটের নিকটস্থ একটী সৌধে নবাব বাস করিতেন, কিন্তু তাঁহার রাজ্যচ্যুতির পর হইতে তাঁহার সম্পত্তিটী মনসারামকে প্রদত্ত হইয়াছে।

মীরঘাটের অনতিদূরে দিবোদাসেশ্বরের মন্দির বিরাজিত। ইহাতে যে মূর্ত্তি আছে তাহা মহাদেবের। কৃষ্ণপ্রস্তর দ্বারা বিগ্রহটী গঠিত। মন্দিরের ভিতর অন্যান্য মূর্ত্তিও আছে, তন্মধ্যে বিশবাহুক একটী। এই মূর্ত্তিটীর কুড়িটী হাত। মন্দিরের পুরোভাগে একটী দীপ আছে। সায়ংকালে এই দীপটী প্রজ্বলিত করা হয়। কার্ত্তিক মাসে মীরঘাটে অলর্ক-চতুর্দ্দশীর মেলা হয়। এই দিনে বীর-চূড়ামণি হনুমানের জন্ম হইয়াছিল। পর দিবস বেলা তিনটার সময় হিন্দুগণ সুগন্ধি তৈল মর্দ্দন করিয়া উষ্ণ জলে স্নান করেন। তাঁহাদিগের বিশ্বাস এই যে, এই স্নান দ্বারা পর বৎসর সেই সময় পর্য্যন্ত তাঁহারা অনাময় থাকিবেন। সূর্য্য উদিত হইলে গরম পোষাক পরিধান করিয়া হিন্দুগণ হনুমানজীর মন্দিরে গমন করেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

নদীসম্মুখস্থ চৌক।

চৌকমহল্লায় উপর্য্যুপরি অনেক ঘাট আছে। প্রথমটীর নাম ওমরাওগীর বোয়ালী। ওমরাওগীর নামে জনৈক গোঁসাই একটী কূপ খনন করেন, তজ্জন্য তাঁহার নামেই উল্লিখিত ঘাটের ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে। অতঃপর জল সইন।

এখানে মৃত ব্যক্তির শবদাহ হইয়া থাকে। স্থানটী মিউনিসিপালিটীর হস্তে আছে। হিন্দুগণ ইহাকে পবিত্র স্থান বলিয়া গণ্য করেন। ইহার পর মণিকর্ণিকার ঘাট। তীর্থপঞ্চকের মধ্যে ইহার স্থান তৃতীয়। তীর্থযাত্রীদিগের মধ্যে কেহই এই স্থানটী দেখিতে ভুলেন না। সহস্র সহস্র যাত্রী প্রতি বৎসর এখানে আগমন করেন। প্রবাদ এই যে, মণিকর্ণিকায় স্নান করিলে সারা জীবনের পাপ ক্ষণমাত্রেই বিদূরিত হয়। বলা আবশ্যক যে, পাপক্ষয় করিবার প্রলোভনে সকলেই এই স্থানে স্নান করেন। এতদ্ধেতু কূপোদকটী পুতিগন্ধ-বিশিষ্ট। কিন্তু তাহাতে কে ভ্রূক্ষেপ করে? যখন ভারতের সর্ব্বস্থানাপেক্ষা এই স্থানের স্নানে পাপক্ষয় ধ্রুব, তখন দুর্গন্ধে কি করিবে? মণিকর্ণিকা সম্বন্ধে কাশীখণ্ডে লিখিত আছে, বিষ্ণু স্বীয় চক্র দ্বারা এই কূপের সৃষ্টি করেন এবং স্বীয় ঘর্ম্ম দ্বারা তাহা পরিপূর্ণ করিয়া দেন। এই জন্য ইহার নাম চক্রপুষ্করিণী। অনন্তর বিষ্ণু উত্তর দিকে যাইয়া যোগে রত থাকেন। ইতোমধ্যে মহাদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কূপের মধ্যে কোটী সূর্য্যের প্রকাশ দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণুর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আনন্দবিহ্বল মহাদেব বিষ্ণুকে বর মাগিবার জন্য আদেশ করিলে বিষ্ণু এই বর চাহিলেন যে, আপনাকে আমার সহিত বাস করিতে হইবে। তখন মহাদেব বলিলেন 'তথাস্তু'। এই বরদান করিবার সময় মহাদেব এত উৎফুল্ল হইলেন যে, তাঁহার শরীর স্পন্দিত হইতে লাগিল, এবং অমনি তাঁহার কর্ণ হইতে কুণ্ডল খসিয়া কূপে পতিত হইল। তদবধি এই কূপ মণিকর্ণিকা নামে খ্যাত। ইহার অন্য নাম "মুক্তিক্ষেত্র" এবং "পূর্ণশুভকরণ"।

কাশীখণ্ডে মণিকর্ণিকা সম্বন্ধে যাহা কিছু লেখা আছে তাহারই আমি উল্লেখ করিলাম। এখন লোকপ্রবাদ সম্বন্ধে লিখিতেছি। এক দিন হরপার্ব্বতী কূপের সন্নিকটে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে দৈবাৎ কূপে পার্ব্বতীর কর্ণাভরণ পতিত হইল। তদবধি মহাদেব স্থানটীকে মণিকর্ণিকা আখ্যা দিলেন। এখানে স্নান করিলে লোকে সম্পূর্ণরূপে তরিয়া যায়। কূপ এবং গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী স্থানে তারকেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। ইঁহার পূজা করিলে মৃত্যুকালে মুমূর্ষু ব্যক্তির কর্ণে ইনি তারক ব্রহ্ম মন্ত্র বলিয়া দেন, তাহার প্রভাবে লোকে ভবযন্ত্রণা হইতে নিস্তার পায়। তারকেশ্বর একটি বারি-পাত্র মধ্যে অবস্থিত, সুতরাং নয়নের অগোচর। বর্ষায় নদীর জল বৃদ্ধি পাইয়া মন্দিরকে নিমজ্জিত করে বলিয়া মন্দিরটী অনেক হানি সহ্য করিতেছে।

মণিকর্ণিকার ঘাটের একটি সোপানো-পরি বিষ্ণুর পদচিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে। তাহা "চরণ পাদুকা" নামে খ্যাত। প্রবাদ এই যে, বিষ্ণু এই স্থানে মহাদেবের পূজা করিয়াছিলেন। কার্ত্তিক মাসে অনেক

লোক এখানে সমাগত হইয়া পূজা করিয়া থাকে। তাহাদিগের বিশ্বাস যে, তাহাতে তাহাদিগের মোক্ষ হইবে। ঘাটের উপরিভাগে লোকপূজিত সিদ্ধ বিনায়ক বা গণেশ দেবের মন্দির। মূর্ত্তিটী লাল রংএ রঞ্জিত। ইঁহার তিনটী নেত্র, হস্তীর ন্যায় শুঁড়, গলে রৌপ্যহার এবং ইন্দুর ইঁহার বাহন। মন্দিরের দুই কোণে দুইটী স্ত্রীমূর্ত্তি অবস্থিত, তন্মধ্যে একটীর নাম সিদ্ধি এবং অপরটীর নাম বুদ্ধি। মন্দিরের নিকট আমেঠীর রাজ-নির্ম্মিত আর একটি সুন্দর মন্দির আছে। মণিকর্ণিকার নীচে ভোঁনস্লাঘাট। ঘাটটী বড়ই জমকাল। এখানে নাগপুরের রাজাদিগের সৌধরাজী বিরাজিত। অনন্তর গোয়ালিয়রের রায়জ বাই নির্ম্মিত হর্ম্মারাজী নিবেশিত অসম্পূর্ণ সিন্ধিয়া ঘাট নয়নপথে পতিত হয়। রায়জ বাইয়ের মানস এই ছিল যে, এই স্থানটীকে সমগ্র বারাণসী ধামাপেক্ষা মনোহর করিয়া প্রস্তুত করিবেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ভিত্তি সুদৃঢ় না হওয়াতে মন্দিরের উচ্চ চূড়াগুলি বসিয়া গিয়াছে। এখন ইহা ভগ্নদশা-প্রাপ্ত—চূড়া এবং সোপানাবলী আমূলতঃ ফাটিয়া গিয়াছে। প্রবাদ এই যে, যখন মন্দির নির্ম্মিত হইতেছিল, তখন নদীতীর হইতে একটী ধারা আসিয়া কারিকরগণের কার্য্যে ব্যাঘাত করিতে লাগিল। উক্ত ধারা কোথা হইতে আসিতেছে জানিবার জন্য একটী গর্ত্ত খোদিত হয়। সেই গর্ত্তে একটি বৃদ্ধ ব্যক্তির সন্দর্শন পাওয়া যায়। বৃদ্ধ ব্যক্তিটী রাম কর্ত্তৃক সীতার উদ্ধার সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন, কিন্তু যখন শুনিলেন যে বারাণসীধামে বহু পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে এবং উহা এখন বিজাতীয়গণের হস্তগত হইয়াছে, তখন তিনি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। এই মহল্লার অন্যান্য ঘাটের নাম সঙ্কটাঘাট, কৌশল্যা ঘাট, গণপতি অথবা রামেশ্বর ঘাট। সঙ্কটাঘাটে সঙ্কটা দেবীর মন্দির আছে। ইহাতে একটি ঘণ্টা ঝুলিতেছে এবং ইহার মধ্যে অনেক মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। সঙ্কটাঘাটের সোপানোপরি মহাবীরজীর একটী বড় প্রতিমূর্ত্তি আছে। মহাবীর মহাদেবের অবতার এবং রামচন্দ্রের এক জন সেনানায়ক।

(ক্রমশঃ)

শিখগ্রন্থাবলী—সুখমণি সাহিব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

৭ শ্লোক।

অগম অগাধ পারব্রহ্ম সোয়।
যো যো কহৈ সো মুক্তা হোয়।
সুন মিতা নানক বিনবন্তা।

সাধ জানাকি অচরজ কথ ॥
সেই পরব্রহ্ম অগম্য ও অপার।
যে তাঁহার নাম করে সেই মুক্ত হয়।
নানক বিনয়ের সহিত বলিতেছেন, হে মিত্র
সাধু জনের আশ্চর্য্য চরিত্র শ্রবণ কর ॥

অষ্টপদী।

সাধ কৈ সংগি মুখ উজল হোত।
সাধ সংগি মল সগলী খোত।
সাধ কৈ সংগি মিটৈ অভিমান।
সাধ কৈ সংগি প্রগটৈ সুজ্ঞান।
সাধ কৈ সংগি বুঝৈ প্রভু নেরা।
সাধ সংগি সভ হোত নিবেরা।
সাধ কৈ সংগি পায় নাম রতন।
সাধ কৈ সংগি এক উপর যতন।
সাধ কী মহিমা বরনৈ কউন প্রাণী।
নানক সাধ কী শোভা প্রভ মাহী সমানী॥১

সাধুসঙ্গে মুখ উজ্জল হয়।
সাধুসঙ্গে সকল মালিন্য ধৌত হয়ে যায়।
সাধুসঙ্গে মনের অভিমান দূর হয়।
সাধুসঙ্গে জ্ঞানের প্রকাশ হয়।
সাধুসঙ্গে প্রভুকে নিকটে মনে হয়।
সাধুসঙ্গে সকল নিষ্পত্তি হইয়া যায়।
সাধুসঙ্গে নামরত্ন লাভ হয়।
সাধুসঙ্গে সেই একের উপর যত্ন হয়।
সাধুর মহিমা কোন জীব বর্ণনা করিতে পারে না।
নানক বলিতেছেন, সাধুর শোভা সেই ভগবানের শোভার সহিত মিলিত ॥১॥

সাধ কৈ সংগি অগোচর মিলৈ।
সাধ কৈ সংগি সদা পরফুলৈ।
সাধ কৈ সংগি আবহি বসি পংচা।
সাধ সংগি অমৃত রস ভুংচা।
সাধ সংগি হোয় সভকী রেণ।
সাধ কৈ সংগি মনোহরি বৈন।
সাধ কৈ সংগি ন কতহূ ধাবৈ।
সাধ সংগি অসথিত মন পাবৈ।
সাধ কৈ সংগি মায়া তে ভিংন।
সাধ সংগি নানক প্রভ সুপ্রসংন ॥২॥

সাধুসঙ্গে অগোচরকে পাওয়া যায়।
সাধুসঙ্গে মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে।
সাধুসঙ্গে পঞ্চেন্দ্রিয় বশে আসে।
সাধুসঙ্গে অমৃত রস ভোগ হয়।
সাধুসঙ্গে মানুষ সকলের রেণু অর্থাৎ বিনয়ী হয়।
সাধুসঙ্গে বাক্য সুমধুর হয়।
সাধুসঙ্গে মন এদিক ওদিক ধাবমান হয় না।
সাধুসঙ্গে মন স্থির হয়।
সাধুসঙ্গে মায়া কাটিয়া যায়।
নানক বলিতেছেন সাধুসঙ্গ করিলে প্রভু প্রসন্ন হন ॥২॥

সাধু সংগি দুসমন সভ মিত্র।
সাধুকে সংগি মহা পুনীত।
সাধ সংগি কিস সিউ নহী বৈর।
সাধ কৈ সংগি ন বীগা পৈর।
সাধ কৈ সংগি নাহি কো মংদা।
সাধ সংগি জানৈ পরমানন্দা।
সাধ কৈ সংগি নাহী হউ তাপ।
সাধ কৈ সংগি তজৈ সভ আপ।
আপে জানৈ সাধ বড়াই।
নানক সাধ প্রভু বণিয়াই ॥৩॥

সাধুসঙ্গের গুণে শত্রু মিত্র হয়।
সাধুসঙ্গে মানুষ পবিত্র হয়।
সাধুসঙ্গের গুণে কাহারও সহিত বৈরিতা থাকে না।
সাধুসঙ্গের গুণে পদস্খলন হয় না।
সাধুসঙ্গে কোন অভাব থাকে না।
সাধুসঙ্গে মানুষ সেই পরমানন্দ পুরুষকে জানিতে পারে।
সাধুসঙ্গের গুণে অহঙ্কারের তাপ থাকে না।
সাধুসঙ্গে অহম্মিকা চলিয়া যায়।
হরি আপনিই সাধুর মহত্ত্ব জানেন।
নানক বলিতেছেন, সাধুতে এবং প্রভুতে এক যোগ ॥৩॥

সাধ কৈ সংগি ন কবহূঁ ধাবে।
সাধ কৈ সংগি সদা সুখ পাবে।
সাধ সংগি বস্তু অগোচর যোহৈ।
সাধ কৈ সংগি অজরু সহৈ।
সাধ কৈ সংগি বসৈ থান উচৈ।
সাধ কৈ সংগি মহলি পহুঁচৈ।
সাধ কৈ সংগি দৃঢ়ৈ সভ ধর্ম্ম।
সাধ কৈ সংগি কেবল পারব্রহ্ম।
সাধ কৈ সংগি পায়ে নাম নিধান।
নানক সাধু কৈ কুর্বান ॥৪

সাধুসঙ্গে কখনও স্থানভ্রষ্ট হইতে হয় না।
সাধুসঙ্গে সদাই সুখ।
সাধুসঙ্গে অগোচর বস্তু পাওয়া যায়।
সাধুসঙ্গে রিপুর বেগ সহ্য করিতে সক্ষম হয়।
সাধুসঙ্গে মানুষ উচ্চ স্থান লাভ করে।
সাধুসঙ্গে ভগবানের গৃহে যাইতে পারে।
সাধুসঙ্গে ধর্ম্ম দৃঢ় হয়।
সাধুসঙ্গে সকল বস্তুতে পরব্রহ্মের সত্তা অনুভব হয়।
সাধু সঙ্গে মানুষ নাম ধন প্রাপ্ত হয়।
নানক সর্ব্বদা সাধুকে বলিহারি যান ॥৪

সাধ কৈ সংগি সভ কুল উদ্ধারৈ।
সাধ সংগি সাজন মীত কুটুংব নিস্তারৈ।
সাধু কৈ সংগি সো ধন পাবৈ।
যিসুধনতে সভকো বরসাবৈ।
সাধ সংগি ধর্ম্মরাই করে সেবা।
সাধ কৈ সংগি শোভা সুরদেবা।
সাধু কৈ সংগি পাপ পলাইন।
সাধ সংগি অমৃত গুণ গাইন।
সাধ কৈ সংগি সর্ব্ব থান গম্মি।
নানক সাধকৈ সংগি সফল জনমি ॥৫

সাধুসঙ্গলাভে সমস্ত কুল উদ্ধার হয়।
সাধুসঙ্গ যে করে তার স্বজন, মিত্র, কুটুম্ব, সকলে মুক্ত হয়।
সাধুসঙ্গে সেই পরম ধন পাওয়া যায়,
যে ধন লইয়া সাধক সকলের উপর বর্ষণ করেন।
সাধুসঙ্গ হইলে ধর্ম্মরাজ অর্থাৎ যম সেবা করে।
সাধুসঙ্গে সুর ও দেবতার শোভা লাভ হয়।
সাধুসঙ্গে পাপ পলায়ন করে।
সাধুসঙ্গে অমৃতের গুণ গান করে।
সাধুসঙ্গে সকল স্থানে যাওয়া যায়।
নানক বলিতেছেন, সাধুসঙ্গলাভে জন্ম সফল হয় ॥৫

সাধ কৈ সংগি নহি কছু ঘাল।

দর্শন ভেট হোত নিহাল।
সাধ কৈ সংগি কলুখত হরৈ।
সাধ কৈ সংগি নরক পর হরৈ।
সাধ কৈ সংগি ইহা উহা সুহেলা।
সাধ সংগি বিছুরত হরি মেলা।
যো ইচ্ছে সোই ফল পাবৈ।
সাধ কৈ সংগি না বিরথা যাবৈ।
পার ব্রহ্ম সাধ রিদ বসৈ।
নানক উধরৈ সাধ শুন রসৈ॥ ৬
সাধুসঙ্গে কোন বিপদ নাই।
সাধু দর্শন ও সঙ্গ লাভে মানুষ পবিত্র হয়।
সাধুসঙ্গে পাপ দূর হয়।
সাধুসঙ্গ লাভ হইলে নরকে যাইতে হয় না।
সাধুসঙ্গে ইহলোক ও পরলোক সুখকর হয়।
সাধুসঙ্গ ঘটিলে মানুষ হরিকে হারাইলেও আবার পায়।
সাধুসঙ্গের গুণে মানুষ যা ইচ্ছা করে সেই ফলই পায়।
সাধুসঙ্গ কখনও বৃথা যায় না।
পরব্রহ্ম সাধুর হৃদয়ে বাস করেন।
নানক বলিতেছেন, সাধুসঙ্গে জীবন সার্থক হয়॥ ৬
সাধ কৈ সংগি শুনউ হরি নাউ।
সাধ সংগি হরি কৈ গুণ গাউ।
সাধ কৈ সংগি ন মনতে বিসরৈ।
সাধ সংগি সরপর নিসতরৈ।
সাধ কৈ সংগি লগৈ প্রভু মীঠা।
সাধু কৈ সংগি ঘট ঘট ডীটা।
সাধ সংগি ভএ আজ্ঞাকারী।
সাধ সংগি গতি ভাই হমারী।
সাধ কৈ সংগি মিটৈ সভরোগ।
নানক সাধ ভেটৈ সংযোগ॥ ৭
সাধুসঙ্গে হরিনাম শ্রবণ কর।
সাধুসঙ্গে হরিগুণ গান কর।
সাধুসঙ্গে মন হইতে প্রভুর বিস্মরণ হয় না।
সাধুসঙ্গে অবশেষে তুমি উদ্ধার হও।
সাধুসঙ্গে প্রভুকে মিষ্ট লাগে।
সাধুসঙ্গে সর্ব্বঘটে প্রভুর দর্শন হয়।
সাধুসঙ্গে প্রভুর আজ্ঞাকারী হয়।
সাধুসঙ্গে আমাদের সুগতি হয়।
সাধুসঙ্গে সকল রোগ দূর হয়।
নানক বলিতেছেন, সাধুর দর্শন সংযোগে হয়॥ ৭
সাধকি মহিমা বেদন জানহি।
যেতা শুনহি তেতা বখিয়ানহি।
সাধকি উপমা তিহু গুণতে দূরি।
সাধকি উপমা রহি ভরপুর।
সাধকি শোভা কা নাহি অন্ত।
সাধকি শোভা সদা বে অন্ত।
সাধকি শোভা উচতে উচী।
সাধকি শোভা মূচতে মূচী।
সাধকি শোভা সাধ বনিয়াই।
নানক সাধ প্রভ ভেদ ন ভাই॥ ৮
সাধুর মহিমা বেদ জানে না।
যতটুকু শুনিয়াছে, ততটুকু ব্যাখ্যা করে।
সাধুর স্বভাব ত্রিগুণের অতীত।
সাধুর মহিমা সর্ব্বদাই পূর্ণ।
সাধুর শোভার অন্ত নাই।
সাধুর শোভা অনন্ত।

সাধুর শোভা উচ্চ হইতেও উচ্চ।
সাধুর শোভা বৃহৎ হইতেও বৃহৎ।
সাধুর শোভা সাধুতেই সাজে।

নানক বলিতেছেন, হে ভ্রাতঃ, সাধুতে ও প্রভুতে ভেদ নাই॥৮

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত।

(ক্রমশঃ)

ভুত না মানুষ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

একি চণ্ডদেবের চাতুরী, না শত্রুর সতর্কতা।

বিগত রজনীর ক্ষীণালোকের শেষ-রশ্মিটুকু দেখিতে দেখিতে, নন্দক চণ্ডদেবের গৃহের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সজাগ প্রহরী সম্ভ্রমের সহিত তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিল। নন্দক বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই বহির্গমণে উদ্যত বেশভূষায় সজ্জিত একজন মনুষ্যমূর্ত্তি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। নন্দকের চণ্ডদেবের নিকটেই কাজ ছিল, সর্ব্বাগ্রে তিনি চণ্ডদেবের নিকটেই গমন করিতেন। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একটি অদ্ভুত রকমের পুরুষমূর্ত্তি সম্মুখে দেখিয়া তিনি তাঁহার নিকটেই গমন করিলেন। দর্শনমাত্রই তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। এ ব্যক্তি আর কেহই নহে, তাঁহার গর্ভধারিণী মাতা। ইনি পুরুষ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বহির্গমনে উদ্যতা হইয়াছিলেন। নন্দককে দর্শনমাত্রই 'চন্দনী কোথায়, চন্দনী কোথায়' বলিয়া তিনি অনুচ্চস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। নন্দক বিস্ময় সহকারে কহিলেন, 'সেকি! আমি ত অগ্রজাকে গৃহেই দেখিয়া গিয়াছি। ইহার মধ্যে তিনি কোথায় গেলেন?'

"যায়নি, নিজে কোথাও যায়নি, কে জানি না তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে,—বোধ হয় চণ্ডদেবই হইবে।"—বলিয়া চন্দনীর মাতা নন্দকের হস্তধারণপূর্ব্বক অন্তঃপুরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। যখন তাঁহারা চন্দনীর ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন রজনীর অন্ধকারমুক্ত প্রভাত বালারুণদ্বারা বিভূষিত হয় নাই। নন্দক দেখিলেন চন্দনীর শয্যার পার্শ্বে বহুলোকের পদচিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। চন্দনী নিশাকালে লেখা পড়া করিতেন, তজ্জন্য তাঁহার শয্যোপরি কলম, কাগজ ও কালি থাকিত এবং ক্ষুদ্র একটি মৃন্ময় দীপাধারে প্রদীপ রক্ষিত হইত। কার্য্যান্তে তিনি সেগুলি যথাস্থানে স্থাপন করিয়া শয়ন করিতেন। কিন্তু অদ্য তাহা লণ্ডভণ্ড হইয়া পতিত

রহিয়াছে। দীপাধার ভগ্ন হইয়া ভূমিতলে গড়াগড়ী যাইতেছে। নন্দক সে সব বিশেষরূপে দেখিলেন। তৎপরে জননীকে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে কহিয়া চণ্ডদেবের শয়নকক্ষে গমন করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় চণ্ডদেবও গৃহে নাই এবং সে গৃহেও বহু লোকের গমনাগমনের চিহ্ন রহিয়াছে। গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া তিনি জননীর নিকটে সবিশেষ ব্যক্ত করিলেন। জননী কহিলেন, "সে কি! চণ্ডদেবকে আবার কে বান্ধিয়া লইয়া গিয়াছে? সেইত কত জনকে বান্ধিয়া লইয়া যায়। চন্দনীকে একবার হত্যা করিতে পারে নাই, এই বারই হত্যা করিবে। আমি চন্দনীকে উদ্ধার করিতে যাই" এই বলিয়া তিনি গমনোদ্যোতা হইলেন।

নন্দক কহিলেন, 'তিষ্ঠ জননি! আমি আসিতেছি।'

নন্দকের মাতা কহিলেন, নন্দক! তুমি তোমার অন্ধ বিশ্বাস লইয়া গৃহে থাক, আমি কন্যাকে উদ্ধার করিতে যাই, বিলম্বে বিপদের সম্ভাবনা।

নন্দক কহিলেন—তোমার কি বিশ্বাস যে, চণ্ডদেব চন্দনীকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে?

নন্দকের মাতা—হাঁ, চণ্ডদেবেরই এই কর্ম্ম।

নন্দক। তবে চণ্ডদেবকে কে লইয়া গিয়াছে তোমার বিশ্বাস?

মাতা। কেহই লইয়া যায় নাই। সে নিজেই লুক্কায়িত হইয়াছে।

নন্দক কহিলেন, 'এই কি তোমার বিশ্বাস?' নন্দকের মাতা দৃঢ় স্বরে উত্তর দিলেন 'হাঁ।'

নন্দক—কিন্তু আমার বিশ্বাস অন্য প্রকার।

নন্দকের মাতা কহিলেন, 'কি প্রকার?'

নন্দক কহিলেন, "আমি সে সব কথা তোমার নিকট যথাযথ বর্ণনা না করিলেও কিছু কিছু বলিব।"

মাতা। বল।

নন্দক। আমি এই ঘটনা হইতে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর ভাবে জানিতে পারিতেছি যে, আমাদের বিপক্ষের লোক রাজপুতানায় আছে।

মাতা। ইতিপূর্ব্বে চণ্ডদেব নিজ মুখেই "রাজ" বলিয়া এ কথার কতকটা আভাস দিয়াছিল।

নন্দক। সে দিন চণ্ডদেবের মুখে 'রাজ' শুনিয়া, রাজপুতনা বলিয়াই তুমি স্থির করিয়াছিলে, কিন্তু আমার বিশ্বাস অন্যরূপ। আমার বিশ্বাস তিনি রাজপুতানা না বলিয়া ঈশ্বর রাজরাজেশ্বর বলিতে যাইতেছিলেন, কারণ চণ্ডদেব বিপৎকালে অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়েন এবং ঈশ্বরের নাম স্মরণ করেন।

আমি রাজপুতনায় চলিয়া গেলে আমার অগ্রজার বিষয়ে যদি কিছু ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তবে অগ্রে তাহাই আমার নিকট বর্ণনা কর।

মাতা। তুমি চলিয়া গেলে আমি চণ্ডদেবকে পরাজয় করিবার মানসে চন্দনীকে

সুমোহন বেশে সজ্জিত করিয়া প্রেম ভিক্ষা করিবার জন্য চণ্ডদেবের নিকট পাঠাইয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম চন্দনী যদি চণ্ডদেবকে বশীভূত করিতে পারে, তবে চণ্ডদেবের মনের কথাগুলিও টানিয়া বাহির করিতে পারিবে। কিন্তু তাহা হইল না, চন্দনী শত শত চেষ্টাতেও ধূর্ত্ত পাষণ্ডকে বশীভূত বা বিচলিত করিতে পারিল না। বরং তাহার মনের স্বভাবের বিপর্য্যয় ঘটিল।

নন্দক। সে কি রকম?

মাতা। চণ্ডদেবের উপরে যে তাহার একটা মন্দ বিশ্বাস ছিল, তাহা অন্তর্হিত হইল। সে অসাধু চণ্ডদেবের ভণ্ড জিতেন্দ্রিয়তায় বিশ্বাস করিয়া আপনার মনের পূর্ব্ব বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিল এবং তাহাকে প্রেমের চক্ষে দেখিতে লাগিল।

মাতার কথা শুনিয়া নন্দক মৌনাবলম্বন করিয়া অধোবদনে বসিয়া রহিলেন। মাতা কহিলেন, 'কি চিন্তা করিতেছ?'

নন্দক। চন্দনী সাধু চণ্ডদেবকে অসাধু বলিয়া জানিতেন, ইহাতে অসাধু চণ্ডদেব অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁহার মনের ভাবান্তর হওয়ায় অর্থাৎ চণ্ডদেব সাধু, অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা এই কুকর্ম্ম সাধিত হইতেছে, এ কথা বিপক্ষ পক্ষের লোকদিগের পক্ষে বড় নিরাপদের কথা নহে। আমিও চণ্ডদেবকে সাধু বলিয়াই জানি। এখন ভ্রাতা, ভগ্নী মিলিয়া অসাধ্য সাধন করিতে পারিব এই আশঙ্কায় তাহারা আমার সঙ্গে দেখা হইবার পূর্ব্বেই চন্দনীকে অপহরণ করিয়া লইয়া গেল, এই এখন আমার বিশ্বাস। আমার মনের আর একটি ধারণা আছে, তাহাও আমি তোমার নিকট সঙ্ক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর।

'শুনিয়াছি চণ্ডদেব প্রথমে আমার ভগিনীর নিকটে বিবাহের প্রস্তাব করে এবং তাহাকে নিরাশ করায় তিনি চণ্ডদেবকর্ত্তৃক ধর্ম্মহীনা হন। এই ব্যাপারে বুঝিতে পারা যায় যে, চণ্ডদেব আমার ভগিনীর প্রণয়াসক্ত ছিল; কিন্তু আমার ভগিনী তাহাকে প্রেমের চক্ষে দেখিতেন না, বরং ঘৃণার চক্ষেই দেখিতেন। এই ঘটনা হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ভগিনীর অনিষ্টকারী চণ্ডদেব এ চণ্ডদেব নহে। অন্য কোন ব্যক্তি এই চণ্ডদেবের অনিষ্ট করিবার জন্য চণ্ডদেব সাজিয়াছে এবং সে যাহাকে ভাল বাসে সেই চন্দনীই যে এখন সাধুপ্রকৃতি চণ্ডদেবের প্রণয়াসক্ত হইলেন, ইহা তাহার সহ্য হইল না। এই জন্যই সে চণ্ডদেবের গৃহ হইতে ভগিনীকে পৃথক স্থানে লইয়া গেল।

এখন দেখিতে হইতেছে যে, সাধু চণ্ডদেবকে অসাধু চণ্ডদেব কেন সরাইল। যাহারা জালিয়াতী ব্যাপারে অথবা বদমাইসি ও দস্যুতাতে লিপ্ত থাকে, তাহাদের এবং যাহারা তাহাদিগকে ধরিতে চেষ্টা করে তাহাদের প্রেরিত চর সন্দেহজনক সমস্ত স্থানেই লুকায়িত

থাকে, ওরূপ না করিলে কাজের সুবিধা করিয়া উঠা যায় না। এই দেখ না, আমার গুপ্তচরও সন্দেহমূলক স্থানে লুক্কায়িত রহিয়াছে। আমার বিশ্বাস, অসাধু চণ্ডদেবের গুপ্তচরও আমাদের সংবাদ জানিবার জন্য স্থানে স্থানে লুক্কায়িত রহিয়াছে। পুরমণ্ডলে এমন কি ভৃত্যবেশে আমাদের এই বাটীর মধ্যেও তাহারা বাস করিতেছে। আমরা সকলে যেমন চণ্ডদেবের বাড়ীতে পাহারা দিতেছি, তাহারাও তদ্রূপ আমাদিগকে পাহারা দিতেছে, আমরা কি করি কোথায় যাই তাহা জানিবার জন্য। আমি যে চণ্ডদেবের ঘরে থাকিয়া চণ্ডদেবের কাগজ পত্র অনুসন্ধান করিতেছি, তাহা তাহারা জানিতে পারিয়াছে। চণ্ডদেবের নিকটে এমন একটি জিনিষ ছিল যে, তাহা প্রাপ্ত হইলে বিপক্ষদের তত্ত্ব জানিতে পারা যাইবে। এ কথা কিন্তু চণ্ডদেবও জ্ঞাত ছিল না। চণ্ডদেবের পিতা চণ্ডদেবের অজ্ঞাতে চণ্ডদেবের নিকট এই জিনিষটি রাখিয়া গিয়াছিলেন। বিপক্ষেরা তাহা জানিতে পারিয়াছিল এবং আমাকে চণ্ডদেবের গৃহে অনুসন্ধান করিতে দেখিয়া, পাছে আমি সেই জিনিষটি প্রাপ্ত হই—এই ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল। আমি যখন সেই জিনিষটি প্রাপ্ত হইয়া চণ্ডদেবের নিকট লইয়া আসি, তখন আমাদের ভৃত্যবেশী অসাধু চণ্ডদেবের চর তাহা জানিতে পারে, এবং আমি যে সেই মুহূর্ত্তে পুরমণ্ডল ত্যাগ করিয়া রাজপুতানায় গমন করিতেছিলাম, তাহাও তাহারা জানিতে পারে। রাজপুতানার উপরে ইতঃপূর্ব্বে আমার কোনও সন্দেহ হয় নাই। তজ্জন্যই আমি রাজপুতানায় যাই নাই এবং তথায় কোন গুপ্তচরও প্রেরণ করি নাই। উক্ত জিনিষটি লইয়া রাজপুতানায় যাইতেছি দেখিয়া বিপক্ষেরা বেশ বুঝিতে পারিল যে, তাহাদের ধৃত হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই।

অসাধু চণ্ডদেব সাধু চণ্ডদেব সাজিয়া রাজপুতানার মধ্যে চণ্ডদেবের ভদ্রাসন বাটীতে বেশ একটা প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া বসিয়াছে। সকলেই মনে করিতেছে সেই চণ্ডদেবই এই। কিন্তু চণ্ডদেব যে কোথায় তাহা রাজপুতানা-বাসীরা জানে না। অসাধু চণ্ডদেবের লোকজনেরা চণ্ডদেব পুরমণ্ডলে আছে, এই কথা সকলের নিকট প্রকাশ করিতেছে। চণ্ডদেবের রাজপুতানার বাটীতে অনেক লোক। তাহারা সকলেই বলে তাহারা চণ্ডদেবের লোক। অসাধু চণ্ডদেব চৈতন্যদেব নামক এক ব্যক্তির দ্বারা সাধু চণ্ডদেবের গৃহ মেরামত করাইয়া লইয়াছে এবং নিজে লুক্কায়িত থাকিয়া আপন অনুচরবর্গের দ্বারা চৈতন্যদেবকে জানাইয়াছিল যে, চণ্ডদেব পুরমণ্ডল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাহার টাকা চুকাইয়া দিবেন। সাধু চণ্ডদেব কিন্তু ইহার ঘুণাক্ষরও অবগত ছিলেন না এবং তিনি রাজপুতানায় গিয়া চৈতন্যদেবের টাকা চুকাইয়া দিবার জন্য মোটেই প্রস্তুত

ছিলেন না। আমি রাজপুতানায় গিয়া এই কথা শুনিলাম যে, চৈতন্যদেব পুরমণ্ডলে আগমনপূর্ব্বক সাধু চণ্ডদেবকে তাঁহার প্রাপ্য টাকা মিটাইয়া দিতে বলেন, কিন্তু সাধু চণ্ডদেব বাড়ী মেরামত করেন নাই, বলিয়া টাকা দিতে অস্বীকার করেন। তৎপর চৈতন্যদেব আদালতের ভয় দেখাইলে তিনি এই টাকা দিতে বাধ্য হন।

এ কথা আমি পূর্ব্বে ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারি নাই। কি জানি কি ভাবিয়া চণ্ডদেব এ কথা আমাকে জানান নাই। আমি জানিতে পারিলে অনেক দিন পূর্ব্বেই এই উপস্থিত কার্য্যের একটা না একটা কূল কিনারা করিতে পারিতাম। সে যাহা হউক, আমাকে রাজপুতানায় যাইতে দেখিয়া তাহারা বুঝিতে পারিল যে, চৈতন্যদেব যে চণ্ডদেবের নিকট হইতে টাকা লইয়া গিয়াছেন, এ কথা আমার নিকট অপ্রকাশ থাকিবে না এবং এই কথার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্য যত শীঘ্র সম্ভব আমি পুরমণ্ডলে চণ্ডদেবের নিকট ফিরিয়া আসিব।

স্বয়ং চণ্ডদেবকে রাজপুতানায় না লইয়া গেলে আমি একা কখনও রাজপুতানার কোন কার্য্যই নিষ্পত্তি করিয়া উঠিতে পারিব না, কারণ সাধু চণ্ডদেবের অনুপস্থিতিতে অসাধু চণ্ডদেবের অনুচরবর্গই 'আমরা চণ্ডদেবের চর' বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। চণ্ডদেবকে দেখিতে না পাইয়া রাজপুতানাবাসীরাও ঐ কথা প্রত্যয় করিতেছে। এই স্থলে যদি সাধু চণ্ডদেবকে লইয়া রাজপুতানায় উপস্থিত হইতে পারি, তবে অসাধু চণ্ডদেবের অনুচরবর্গের বলবিক্রম সমস্তই ভাসিয়া যাইবে। চণ্ডদেব আপনার গৃহে যাইয়া যখন অপরিচিত ব্যক্তিদিগকে বিতাড়িত করিবেন, তখন অসাধু চণ্ডদেব আর এরূপে লুকাইয়া থাকিতে পারিবে না। পুরমণ্ডলে চণ্ডদেবের গৃহে আমার যেমন প্রভুত্ব রাজপুতনায় চণ্ডদেব ব্যতিরেকে অসাধু চণ্ডদেবের অনুচরবর্গপূর্ণ চণ্ডদেবের গৃহে আমার সেইরূপ প্রভুত্ব আছে কি? সে বাড়ীতে কি তাহারা আমাকে ঢুকিতে দিবে? বা কোন স্থানে অনুসন্ধান করিতে দিবে? আমি জোর করিয়া প্রবেশ করিতে চাহিলে তাহারাও আমাকে জোর করিয়া তাড়াইয়া দিবে। কিন্তু চণ্ডদেবকে লইয়া যদি সেইখানে উপস্থিত হইতে পারি, তবে তাহাদের প্রভুত্ব কোথায় থাকিবে? চণ্ডদেবের গৃহে আমারই প্রভুত্ব অধিক হইবে। হয়ত সেই গৃহের কোন না কোনও স্থানে আমাদের বাঞ্ছিত নিধিগুলি কারারুদ্ধ রহিয়াছেন, আমি অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারিব। অতএব আমি যে অতি শীঘ্রই পুরমণ্ডলে চণ্ডদেবের নিকটে ফিরিয়া আসিব, ইহা তাহারা বুঝিতে পারিল এবং যাহাতে আমার চণ্ডদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হয়, তাহাও করিল—চণ্ডদেবকে লুক্কায়িত করিল। এখন যদি চিরকালের

মত চণ্ডদেবকে না পাই, তবে চিরকালের মত অসাধু চণ্ডদেব প্রকৃত চণ্ডদেব হইয়া রাজপুতানায় ও পুরমণ্ডলে প্রভুত্ব করিবে। চিরকালের মত প্রতিধ্বনি ও ভাবময়ীও অন্তর্হিতা রহিবেন। কারণ আমার বিশ্বাস, রাজপুতানার সেই বাড়ীর মধ্যেই তাহারা রহিয়াছেন—এমন গুপ্ত স্থানে রহিয়াছেন যে, সেই বাড়ীতে কিছুকাল বসবাস না করিলে তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করা অসাধ্য। চণ্ডদেব ব্যতীত ঐ গৃহে আমি কোন দিনই একা বাস করিতে পারিব না। তবে ছদ্মবেশে প্রচ্ছন্নভাবে সেখানে গিয়া বাস করিতে পারি। কিন্তু সে সময়সাপেক্ষ এবং বিপজ্জনক। অতএব এই সময় চণ্ডদেবকে পাওয়া আমার নিতান্ত আবশ্যক। তাহাদেরও নিতান্ত প্রয়োজন যে, চণ্ডদেবের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ না হয় এবং তজ্জন্যই নির্দ্দোষ চণ্ডদেবের এই দশা। এক্ষণে চণ্ডদেবকে খুঁজিয়া বাহির করাই আমার প্রধান কাজ।' এই কথা বলিয়া নন্দক নীরব হইলেন।

নন্দককে নীরব হইতে দেখিয়া নন্দকের মাতা ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া বলিলেন, 'ওরে ভীরু কাপুরুষ নন্দক! তুই চণ্ডদেবের তোষামদ করিয়াই জীবন কাটাইবি দেখিতেছি। তোর মত নির্ব্বোধ ভীরু লোক আমি পৃথিবীতে কুত্রাপি দর্শন করি নাই। তুই স্তব কর, লোকে যেমন ঈশ্বরকে স্তব করে সেইরূপ তুই চণ্ডদেবকে স্তব কর,—এই বলিয়া তিনি একটু দূরে গিয়া জানু পাতিয়া বসিয়া ভঙ্গিসহকারে বলিতে লাগিলেন, "এইরূপে স্তব কর্ 'হে চণ্ডদেব তুমিই ধাতা, তুমিই বিধাতা, তুমিই নির্গুণ, তুমিই সগুণ, গুণময় ও গুণাতীত ইত্যাদি।'

নন্দক জননীর ভাবভঙ্গি দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এত কথার দ্বারাও যে তিনি মাতার মন বিচলিত করিতে পারিলেন না, ইহাতে মাতার উপর তাঁহার একটু অভিমানের ভাবও আসিল। তিনি কহিলেন, 'মা চুপ কর, অত জোরে কথা কহিও না, বুঝিতে পারিতেছি না, বিপক্ষের কোন লোক আমাদের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে বাস করিতেছে কি না।'

মাতা! তুই চণ্ডদেবকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিস, কিন্তু আমি সেজন্য একটুকুও ব্যাকুল হই নাই।

(ক্রমশঃ)

সমালোচনা।

সাহানা—শ্রীমতী সুনীতি দেবী প্রণীত। মূল্য ॥০ আট আনা। সাহানায় একটী ক্ষুদ্র বালিকার আট বৎসর হইতে ১৫ বৎসর বয়সের সকল রচনা (পদ্য এবং গদ্য) প্রকাশিত হইয়াছে। বালিকার লিখিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলি প্রায় সমস্তই মধুর হইয়াছে। প্রাপ্ত বয়সে বালিকা যে একজন সুকবি হইতে পারিবে, আমরা এরূপ আশা করিতে পারি।

বামারচনা।

হিমানীর বিদায়-প্রার্থনা।

বসুধা গো স্নেহময়ি! বহুদিন প্রায়
কুয়াসা, হিমানী মোরা এসেছি হেথায়,
　　কি এক ঘুমের ঘোরে,
　　রেখেছে বিভোর করে,
সহসা জাগিয়া দেখি প্রকৃতি-বালায়
ধীরে ধীরে সুসজ্জিতা মণিমুকুতায়।
　　মধুর সমীরভরে
　　কোকিল কূজন করে,
বাহিরে বসন্ত বুঝি আসিছে ত্বরায়,
দেগো মা বসুধে! এবে মোদের বিদায়।
　　সহসা কিসের তরে
　　পরাণ কেমন করে,
আজ বুঝি খুলে ওই স্বরগদুয়ার
ডাকিছেন সকাতরে দেবতা আমার।
　　হেথায় থাকিতে, ধরা!
　　পারি নাগো আর মোরা,
আসিয়াছে নববধূ কুয়াসা সুন্দরী
অবনতা লজ্জাশীলা দিবাবিভাবরী।
　　সেও ত মা পরাধীনা,
　　অবলা কাঙ্গাল দীনা,
ছাড়িয়া অমরপুর এ মর ধরায়
আসিয়াছে বহুদিন হল গত প্রায়।
　　হেথাও মোদের তরে,
　　প্রকৃতি বিষাদ করে,
ফুলেরা ফুটেনা যেন মেলিতে নয়ন,
তাদের মরমতলে কি যেন বেদন।
　　যতনে ভরিয়া ডালা,
　　বিটপী গাঁথে না মালা,
বহে না কো মৃদু মন্দ মলয় পবন
মক্ষিকা করে না মুখে মধু আহরণ।
　　আজিও রয়েছে ভবে,
　　মোদের কুহকে সবে,
জাগিয়া উঠিবে পুনঃ বসন্তের বায়,
আমি না থাকিলে মাগো কিবা আসে যায়।
　　সম্মুখে বসন্ত আসি,

ঢালিবে অমৃতরাশি,
ফুটিবে কুসুমচয় সোণার লতায়,
সবারি পরাণে ব'বে ত্রিদিবের বায়।
তুমি ও মা বসুন্ধরা,
থাকিবে অমিয়াভরা,
দুঃখিনী হিমানী আমি বিষাদপ্রতিমা
জানাব এ অশ্রুনীরে তোমার মহিমা।
স্নেহময়ী তুমি হায়,
আপনার স্নেহছায়
রাখিয়াছ সযতনে তুমি গো জননী,
আবার তোমারি বুকে ফিরিবে হিমানী।
আমাদের সুরপুর,
হেথা হতে বহুদূর,
চল যাই ফুরা'ল গো স্বরগের বালা,
জুড়াক বসন্ত আসি তাপিতের জ্বালা।
মোরা চলে যাই ঘরে,
পুনঃ সে আসিব ফিরে,
নমো নমো বসুমতি! পড়ি তব পায়,
বৎসরের তরে মাগো হইনু বিদায়।
শ্রীমনোরমা রায়।

শশী ও তারা।

জোছনায় ভেসে গেছে নিখিল আকাশ
নিবিয়া গিয়াছে সব তারকার হাসি,
একাকী একটি তারা আর শশধর
পরকাশি যে যাহার মুক্ত রূপরাশি
চেয়ে আছে পরস্পর কত ভালবাসি।
শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

ছায়া-তরু।

১

দেখিলাম ভাল ক'রে সংসার খুঁজিয়া,
নাইরে এমন কেহ,
মধুর শীতল স্নেহ
বিতরি, জুড়ায় বুক, বেদনা বুঝিয়া।
সংসার আতপে জ্বলে,
আসি ছায়া-তরু-তলে
বসিলেই, জুড়াইত, শরীর অন্তর,
থাকুক সংসার-তাপ হাজার প্রখর।

২

সেই ছায়া-তরু হ'তে, নির্ম্মম সংসার
সরাইল অবিচারে,
বুঝিতে দেখিল নারে,
ফুরাইল জীবনের বাসনা এবার!
বেদনা বিষম কত,
যদি দেখাবার হ'ত,
নিদয় জগতে আজি হৃদয় খুলিয়া—
দেখাতাম, বুঝিবে না, কি কল বলিয়া?

৩

জুড়াবে কি প্রাণ পুনঃ চরণ-ছায়ায়?
ভ্রমি রৌদ্রে, হিমে শীতে,
অতি বৃষ্টি-জলে তিতে,

করিব রে মুক্তি-ভিক্ষা, দর্শন-আশায়।
চাহি না যক্ষের ধন,
চাহি না নন্দন বন,
চাহি না গো চন্দ্রলোকে, করিবারে বাস।
শুধু এক দিন দেখা, পূরিবে না আশ ?

৪

অবনী অমরাবতী যে সঙ্গে থাকিয়া,
স্বপন ব্যতীত তাঁরে,
আর কি দেখিব নারে,
খালি কি সে মূর্ত্তি, মনে রাখিব
আঁকিয়া ?
যাঁর সহবাসে থাকি,
যাতনা আড়ালে রাখি,
সে শান্তিদায়িনী মূর্ত্তি, দেখিব না আর,
ঔষধ লাগে না রোগে দরশনে যাঁর ?

৫

কি যে সেই শুভযোগ, প্রাণস্নিগ্ধকর,
মধুর দর্শনসুখ,
পবিত্রতা-মাখা মুখ,
অপূর্ব্ব সে দেবীমূর্ত্তি, কত যে সুন্দর।
সমস্ত সংসার দিলে,
তার না সমান মিলে,
মধুর পরশ-সুখ, উপমা যে নাই।
পারিজাত পরশন—কি তুলনা চাই !!

৬

হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী, কোথারে আমার,
থাকিলে যাঁহার কাছে,
জগৎ-অস্তিত্ব আছে—
ভুলে যাই (ভুলে যাই) আপনারে
দরশনে যাঁর।
না জানি কি রস দিয়ে,
হৃদয়ের আঁখি দিয়ে
দেখেছি তাহাকে যেগো, কি কহিব আর,
প্রাণের ঘুমন্ত ঘোর কি নেশা যে তার॥

৭

কুবেরের ধনরাশি, বিবিধ-আগার,
যারেক দর্শনে যে রে,
বিনিময় করিতে রে,
চাহেনা, চাহেনা কভু পড়িত হৃদয়।
সংসার পরাণ ঢালি,
যদি ভাল বাসে খালি,
তথাপি গো সে প্রেমের বিন্দু পরিমাণ—
পারেনা জগৎ কভু করিতে প্রদান॥

৮

বেঁধেছে হৃদয় যেই করুণা বিতরি,
যাঁহার চরণ-ছায়,
জীবন জুড়ায়ে যায়,
ভুলি গো সকল জ্বালা, আপনা পাসরি ;
দুঃখ ঘৃণা অভিমান,
ভুলিয়ে এ ছার প্রাণ,
ভুলি গো মরণ—সাধ, দর্শন আশায়,
ভুলি এ অনল রাশি, ভাবিয়া তাহায়॥

শ্রীহরিমতি দেবী
বাজপুর।

আমি।

যত সুর যত রঙ্গে বাজে যেই স্থানে,
সকল ঝঙ্কার যেগো আমার পরাণে।
আমি যেন বার্থ আশে সভামধ্যে আছি,
সবি যেন সুগোপনে মোর কাছাকাছি।

অব্যক্ত আমার ভাবা সবামধ্যে পাই,—
আমাতে সকলি আছে খুঁজিলে হারাই।
আমাতে সকলি আছে আমি ও সকলে,
এও যে রহস্য বড় বুঝায় কৌশলে।

———

প্রবোধ।

ওরে অভিমানি মন! কেন তোর এত
অভিমান?
সংসারে থাকিয়া লোকে সহিতেছে কত
অপমান।
কভু সম্মিলন সহে, কখনো বিরহে দহে,
কভু সুখ, কভু দুঃখ, বিধাতার এ চির
বিধান,
কেন তোর অকারণে বল্ তবে অভিমান?
হা অবোধ! যে নিয়ম প্রচলিত পৃথিবীতে,
তুই কি নূতন এলি নূতন জগৎ হতে?
অলঙ্ঘ্য নিয়ম-বলে, যে জগৎ নিত্য চলে,
তুই কি তাহার গতি পারিবিরে ফিরাইতে?
হা অবোধ! চিরই যে এনিয়ম পৃথিবীতে।
কেন মিছে অভিমানে হোস্ তুই
জ্ঞানহারা?

কেন মিছা অভিমানে ঢালিস নয়নধারা?
তোর ও নয়নজল, কার কি করিবে বল্?
গলাতে নারিবে কারো হৃদয় পাষাণ-পারা,
তবে কেন অভিমানে হোস্ তুই জ্ঞানহারা?
মুছে ফেল অভিমান, মুছে ফেল ওরে মন!
ভুলে যা আপন ব্যথা পরদুঃখে দে'রে মন।
সংসারেতে কত লোকে, কাঁদিছে রে
দুঃখে শোকে,
ঘুচাতে তাদের ব্যথা কর তুই প্রাণপণ,
মন হতে অভিমান মুছে ফেল ওরে মন।
ক্ষুদ্র অভাবেতে তুই ভুলে যাস দেবতার
কত দয়া তোর পরে, ভাবিসনে একবার,
চেয়ে দেখ চারি ধারে দেশ ভাসে হাহাকারে
নিজ দুঃখ ভুলি মুছা তাদের নয়নধার,
বুঝিবিরে তোর পরে কত দয়া দেবতার।

শ্রীমতী অনুপমা।

৩৭ নং মধুরায়ের লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক ৩৯ নং আন্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 619. March, 1915.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫২ বর্ষ। ৬১৯ সংখ্যা। ফাল্গুন, ১৩২১। মার্চ্চ, ১৯১৫। ১০ম কল্প। ৩য় ভাগ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৪—শান্তম্।

১। এত বেগে পৃথিবী ঘোরে যে, আমরা তাহার বুকের উপর থেকেও তাহার বাষ্পও জানি না। অনন্ত কোটী জীবের আহারদানে তিনি অনিমেষ ব্যস্ত, কিন্তু কুত্রাপি তাহার বিন্দু-বিসর্গও দেখা যায় না।

২। তাঁহারই শক্তি অলক্ষিত ভাবে আমাদের মধ্যে থাকিয়া জগৎ-পালনের কার্য্য করে, আমরা মনে করি সে আমরাই করি। এত আত্মগোপনকারী তিনি, এবং আত্মগৌরব-প্রচারে উন্মত্ত আমি।

৩। নিদারুণ গ্রীষ্ম হক্তে বাঁচিবার জন্য, মানুষ রাজপথে জল ছিটায়, ফোয়ারা করে, থসথসের টাটে জল দেয়। কিন্তু এই সকল বাহ্য আয়োজনেও আশানুরূপ ফল হয় না। অন্য দিকে এই ক্লেশ দূর করিবার জন্য সেই আত্মগোপনকারীর কৌশল কেমন অদ্ভুত। অদৃশ্যভাবে বাষ্পকণা সংগ্রহ করিয়া, তিনি মেঘের সঞ্চার করেন, এবং যখন অজস্রধারে বারিবর্ষণ হয়, তখন পৃথিবীর সর্ব্বতাপ দূর হয়, এবং স্নিগ্ধ বায়ুতে আকাশ পর্য্যন্ত সুশীতল হয়। নিগূঢ় ভাবের এমন কৌশল।

—

৫—শিবম্।

১। উত্তাপে যখন পৃথিবীর বুক ফেটে যায়, বৃক্ষ লতা মর মর হয়, তখন কাল মেঘে আকাশের মুখ অত্যন্ত রাগপূর্ণ দেখায়। ভয়ঙ্কর বজ্রনাদে প্রাণ চমকিয়া উঠে

তাহা দেখে তোমার কোপভাব মনে হয়। আবার বজ্রপাতে কত সময়ে গাছ পালা ভেঙ্গে যায়, পুড়ে যায়, কিন্তু ক্ষণপরেই অবিরাম জলধারায় সে সব তাপ দূর হয়, সবই সরস হয়। তাই বলি—"তোমার রাগে রাঙ্গা চক্ষুতলে বহে দেখি প্রেম সাগর।"

২। প্রসবের অসহ্য যন্ত্রণা সন্তানের চাঁদমুখের নকীব। ইহাও মঙ্গলের দূত।

৩। অসহ্য রোগ যাতনা, দুঃসহ শোক ও বার্দ্ধক্যের অসহায় অবস্থায় উদ্ধারের উপায় যে মৃত্যু তাহাও কত মঙ্গলের হেতু।

৬—অদ্বৈতম্।

১। সূর্য্যের সঙ্গে পৃথিবীর অব্যবচ্ছেদ সম্বন্ধ। তাই শীতে আধমরা হয়ে, জলে ডুবে, অগ্নিতে পুড়েও সে মুখ অন্য দিকে ফিরায় না। তারই উপর তার সম্পূর্ণ নির্ভর বলে আবার তার বুকে বসন্ত-সমাগমে কতই সুখের আয়োজন হয়।

২। এখানে সূর্য্য অদৃশ্য হয়, অমনি আঁধার, বিষাদ ও ভয় উপস্থিত হয়। কিন্তু অন্য স্থানে সুপ্রভাত হয়, অরুণ-ভাতি প্রকাশ পায়, প্রাতে পক্ষী আনন্দ-রবে উন্মত্ত হয়, জগতে নবজীবনের স্রোত বহিয়া যায়। উদয় ও অস্তে, চিরদিনই সে, সেই একই আকাশের—একই পৃথিবীর পানে চায়।

৩। সকল মূল্যেরই মূলাধার এক। এই একেরই দ্বারা সর্ব্ব রাশির উৎপত্তি। যে শূন্যের কোন মূল্যই নাই, এই একের পশ্চাতে তার মূল্য দশ গুণ, শতগুণ ইত্যাদি। নির্গুণ মানুষ সেই একের পশ্চাতে আসিলে এইরূপে অসীম পরিমাণে তাহার গুণ ও মূল্য বাড়িয়া যায়। আবার একের ঠিক কাছ থেকে যে শূন্য যত দূরে, তার মূল্য ততই বেশী হয়।

৭—শুদ্ধম্।

১। নিষ্পাপ হয়ে শিশু জগতে আসে। সে ছলনা, কপটতা জানে না। অশুদ্ধ নরনারীর নিকট সেই শুদ্ধমপাপবিদ্ধমের একটু আভাস দিবার জন্য শিশু জন্মে। সে স্বর্গের সুসমাচার-বাহী দেবদূত।

২। অক্ষম শিশু আপনার মলমূত্রে আপনি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। অন্যের ঘৃণা হতে পারে, কিন্তু মায়ের পক্ষে তা অসম্ভব, তিনি ধুয়ে পুঁছে তাহাকে কোলে তুলে লন। এ সব কেবল দুর্ব্বল মানবের ও